বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক অংশগ্রহণঃ ঢাকা জেলার দক্ষিণখাঁন ও কালিয়াকৈর ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা।

গবেষক
মারুফ আহমেদ
রেজিস্ট্রেশন নং ১৩৩
শিক্ষাবর্ষঃ ২০০০-২০০১

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

R
B M.P.L
320.84054
.922
AHB

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

402466

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণ ঃ ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের

জন্য উপস্থাপিত

GIFT

ফেব্রুয়ারী, ২০০৫

গবেষক
মারুফ আহমেদ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

402466

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ দিলরওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
অধ্যাপক ও চেয়ারপার্সন
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্য য়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
402466

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার একজন অসম্ভব প্রিয় শিক্ষক

অধ্যাপক, দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীনকে

যিনি আমাকে অফুরন্ত জ্ঞান আহরণের সুযোগ দিয়ে জগৎটাকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছেন।

402466

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

Dr. Dil Rowshan Zinnat Ara Nazneen
Professor and Chairman
Department of Peace and Conflict Studies
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh

E-mail: duregstr@bangla.net
Fax: 880-2-8615583
Phone: 880-2-8612792(Res.)

প্রত্যয়ন পত্র

মারুফ আহমেদ, রেজিঃ নং ১৬৬ শিক্ষাবর্ষ ২০০০-২০০১, এম.ফিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত এম.ফিল, ডিগ্রীর জন্য বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতক ক্ষমতায়নঃ **"ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক গবেষণাটি আমার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়েছে।

402466

আমার জানামতে এটি একটি মৌলিক গবেষণা এবং এর তথ্যসমূহের অধিকাংশ মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত। তবে কিছু মাধ্যমিক উপাত্তও ব্যবহৃত হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যত্র কোন ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন দেয়া হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ডঃ দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণঃ ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ খৃঃ

মারুফ আহমেদ
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

সূচী			পৃষ্ঠা নং
অধ্যায়-১	ঃ	ভূমিকা ও গবেষণার পদ্ধতি	১-২৮
অধ্যায়-২	ঃ	স্থানীয় সরকারের ধারণা	২৯-৬৫
অধ্যায়-৩	ঃ	স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও পর্যালোচনা	৬৬-৮৪
অধ্যায়-৪	ঃ	তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বয়করণ	৮৫-১৩৬
অধ্যায়-৫	ঃ	২০০৩ নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী দায়িত্ব	১৩৭-১৪৫
অধ্যায়-৬	ঃ	স্থানীয় সরকার বিষয়ে গণমাধ্যমের (সংবাদপত্র) ভূমিকা	১৪৬-১৫৫
অধ্যায়-৭	ঃ	গবেষণা ফলাফল ও সুপারিশমালা	১৫৬-১৬৭
		উপসংহার	১৬৮-১৭৭
গ্রন্থপঞ্জী,			১৭৮-১৮৫
পরিশিষ্ট-১		ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা	১৮৬-১৮৮
পরিশিষ্ট-২		পুরুষ সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা	১৮৯-১৯০
পরিশিষ্ট-৩		ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা	১৯১-১৯৩
পরিশিষ্ট-৪		জনগণের মতামত জরিপের প্রশ্নমালা	১৯৪-১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল তালিকাঃ

১.১	বিকেন্দ্রীকরণ ও বিপুঞ্জীভূতকরণের পার্থক্য	১৪
১.২	দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ড	১৮
১.৩	দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ	১৮
১.৪	নাসিরাবাদ ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ড	১৯
১.৫	নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ	১৯
২.১	১৯৭৩-২০০৩ পর্যন্ত ইউপিতে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের অবস্থান	৪১
২.২	আইন সভায় সরাসরি নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণের চিত্র	৪৩
২.৩	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্ব	৪৩
২.৪	নারী মন্ত্রীদের অংশগ্রহনের হার	৪৪
২.৫	বিভিন্ন বৎসর দেশী ও বিদেশী এনজিওর সংখ্যা	৬১
২.৬	বর্তমানে নিবন্ধকৃত এনজিও সংখ্যা (জুন ২০০৪)	৬১
২.৭	এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিলের উৎস	৬৪
৩.১	মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসন	৬৭
৩.২	Structure of the Basic Democracies	৭৪
৪.১	বিভাগ ভিত্তিক চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনে মহিলা (২০০৩)	৯৪
৪.২	দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের পেশা	১০৭
৪.৩	দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা	১০৯
৪.৪	মতামত জরীপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১১০
৪.৫	পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে মতামত	১১১
৪.৬	পরিষদের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের ধরন	১১২
৪.৭	উন্নয়ন সম্পর্কে ইউনিয়নবাসীদের মতামত	১১৩
৪.৮	দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নে উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ	১১৩
৪.৯	সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে মতামত।	১১৪
৪.১০	মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত	১১৬
৪.১১	ভোট প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত	১১৮

Dhaka University Institutional Repository

৪.১২	মহিলাদের ভোট কেন্দ্রে আসার কারণ	১১৮
৪.১৩	গ্রাম উন্নয়নে এনজিওদের কর্মসূচী	১১৯
৪.১৪	এনজিওদের কাজের ইতিবাচক পরিবর্তন	১১৯
৪.১৫	গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত	১২০
৪.১৬	ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১২১
৪.১৭	ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের পেশাগত অবস্থান	১২২
৪.১৮	ইউপি সদর্সদের মাসিক আয়	১২২
৪.১৯	ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের বয়স	১২৩
৪.২০	মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে মতামত	১২৭
৪.২১	সংরক্ষিকত আসনের সদস্যদের প্রভাব সম্পর্কে মতামত	১২৮
৪.২২	স্থানীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে মতামত	১২৮
৪.২৩	মহিলা সদস্যেদের সভায় উপস্থিত প্রসঙ্গে মতামত	১২৯
৪.২৪	রাজনৈতিক দলের সদস্য প্রসঙ্গে মতামত	১২৯
৪.২৫	নির্বাচনের পূর্বে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে মতামত	১৩২
৪.২৬	নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রসঙ্গে মতামত	১৩২
৪.২৭	নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে মতামত	১৩৩
৪.২৮	পরিবারের সহযোগিতা প্রসঙ্গে মতামত	১৩৪
৪.২৯	মহিলা সদস্যদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে মতামত	১৩৫
৪.৩০	মহিলা সদস্যদের কাজের সুযোগ প্রসঙ্গে মতামত	১৩৫
৫.১	দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের নির্বাচনী ফলাফল (২০০৩)	১৪০
৬.১	জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের আধেয়	১৪৭
৬.২	জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের পৃষ্ঠগত অবস্থান	১৪৮
৬.৩	জাতীয় দৈনিকে সাস্থীয সরকার বিষয়ক সংবাদের শিরোনামের আকার	১৪৮
৬.৪	জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের ধরন	১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র তালিকা

২.১.	ক্ষমতার পিরামিড	৩৩
২.২	মহিলাদের অর্থ উপার্জনে বাধার কারণ সমূহ	৪৫
২.৩	গ্রাম সরকার কাঠামো	৫২
৩.১	বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো	৮১
৪.১	দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের পেশা	১০৬
৪.২	নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের পেশা	১০৭
৪.৩	দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের বয়স	১০৮
৪.৪	নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা	১০৮
৪.৫	দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১০৯
৪.৬	নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১১০

মানচিত্র তালিকা

১.১	বাংলাদেশের মানচিত্র	২০
১.২	ঢাকা জেলার মানচিত্র	২১
১.৩	সবুজবাগ থানার মানচিত্র	২২
১.৪	দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মানচিত্র	২৩
১.৫	খিলগাঁও থানার মানচিত্র	২৪
১.৬	নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মানচিত্র	২৫

কেস ষ্টাডি নং	১	৯৬
কেস ষ্টাডি নং	২	৯৭
কেস ষ্টাডি নং	৩	৯৮
কেস ষ্টাডি নং	৪	৯৯
কেস ষ্টাডি নং	৫	১০০
কেস ষ্টাডি নং	৬	১০১
কেস ষ্টাডি নং	৭	১০২
কেস ষ্টাডি নং	৮	১০৩
কেস ষ্টাডি নং	৯	১০৪

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রায় একশো বছর আগে স্থানীয় শাসনের জন্য এক ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ঔপনিবেশিক যুগে প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ছিল সীমিত। বিশেষ করে সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ে বিধি নিষেধ ছিল প্রচুর এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছিল বিস্তৃত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হয় এবং কতগুলো গ্রামের সমাহারে একটি স্থানীয় শাসনের স্তর সৃষ্টি হয়। বৃটিশ শাসকরা এসময় ইউনিয়ন ও জেলাতে দুই স্তর বিশিষ্ট্য স্থানীয় শাসন চালু করে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলনের পেছনে তাদের দুটো উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ তাদের হাতকে শক্তিশালী করা, দ্বিতীয়তঃ উপমহাদেশে তাদের আধিপত্য বিস্তার করা। বৃটিশ সরকার স্থানীয় সরকারকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতো ফলে স্থানীয় সরকার স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেনি। উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রসারের ফলে ষাটের দশকে থানা কাউন্সিল একটি প্রাণবন্ত স্থানীয় শাসনের ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠে। এ স্তরে কোন রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা ছিল না এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ছিলেন বিশেষ সক্রিয়।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি সরকারের আগমন ঘটেছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে সরকারের পরিবর্তনে প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে বিষয়টি সম্পুর্ণ বিপরীত। এখানে সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রশাসনেরও পরিবর্তন ঘটে। এ ধরনের পরিবর্তন ঘটানোর প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্ষমতাসীন জাতীয় সরকারের সীমিত জনপ্রিয়তাকে সুবিধা অনুযায়ী বিন্যাসের পথ প্রশস্ত করা। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয় যে, স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারকে স্বাধীন ভাবে কাজ করার কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। বরং বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময় অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে সংকুচিত করে নিজেদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করেছে। এই অধ্যাদেশ বা আইন জারীর পেছনে পার্লামেন্টের সমর্থন থাকতো না। একটি বিশেষ সময় অধ্যাদেশ জারী করে পরবর্তীতে পার্লামেন্টে বিশেষ পন্থায় পাশ করিয়ে নেয়া হতো। ক্ষমতা কুক্ষিগত কিংবা ব্যক্তি স্বার্থ সংরক্ষণই ছিল অধ্যাদেশ জারীর উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কারণে স্থানীয় জনগণ তাদের প্রাপ্য অধিকার হতে সব সময় বঞ্চিত হয়। স্থানীয় সাধারণ জনগণকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দেশে রয়েছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা দেশের আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে। রাষ্ট্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা জনগণের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। এটাই হলো গণতান্ত্রিক রীতি কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরণের গণতান্ত্রিক রীতি খুব কম অনুসরণ করা হয়। তাই ৭১ পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের যথার্থ উদ্যোগ ও প্রজ্ঞার অভাব সরকারগুলোর অস্বাভাবিক দুর্বলতা ও উৎপাদনশীল কর্মতৎপরতার অনুপস্থিতি এবং আমলাদের অবাধ শাসন, শোষণ ইত্যাদি বলবৎ থাকায় উপর থেকে নিম্ন পর্যন্ত জনগণের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ধাপ হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। এই স্তরটি স্থানীয় জনগণের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। এই স্তরের দৈনন্দিন ক্রিয়া কর্মে ও নানাবিধ উন্নয়নমুলক কর্মকান্ডে জনগণের পক্ষে ব্যাপক হারে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ যতটা সহজ অন্য কোন স্তরে ততটা সহজ নয়। তাই ইউনিয়ন পরিষদগুলো দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানকার স্থানীয় সরকারগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে কিন্তু আমাদের দেশে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে।

দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক তৃণমুল পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রামে বসবাস করে। গ্রামের উন্নয়ন ছাড়া এবং বিশেষ ভাবে বলতে গেলে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন ছাড়া এদেশের উন্নয়ন এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। এসব সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য গ্রামাঞ্চলে শক্তিশালী সংগঠনের দরকার। নতুবা এসব সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়। তাই শহরাঞ্চলে অপেক্ষা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলকেই উন্নয়ন কর্মধারার শীর্ষে নিয়ে আসতে হবে এবং নানা উৎপাদনমূলক কর্ম

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত শহরমুখী কর্মজীবি নিরন্ন মানুষের স্রোত বন্ধ করতে হবে এর জন্য প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত বেশী একারণে যে, এটি তৃণমূল পর্যায়ের একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। আমরা ইচ্ছে করলে এ প্রতিষ্ঠানটিকে গ্রাম উন্নয়নের সকল কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করতে পারি। কৃষি, শিক্ষা, মৎস, কুটির শিল্প স্থাপন ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ, বেকার সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে সম্পৃক্ত করে আমরা এ গ্রাম বাংলার জীর্ণ চেহারাটা পাল্টিয়ে ফেলতে পারি। স্থানীয় নেতৃত্বের বিকাশ ছাড়া দেশের কোন কাঙ্খিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এটা আমরা জানি ও বুঝি। তবুও আমরা ইউনিয়ন পরিষদকে স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিচ্ছিনা। আমরা ঝুলিয়ে রেখেছি আমলাতন্ত্রের এক ধারালো অস্ত্র ইউনিয়ন পরিষদের মাথার ওপর। আমরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির চেয়ে আমলাদের অধীনে থাকতেই বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করি। আমাদের এ মানসকিতার পরিবর্তন না হলে তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র হবে অর্থহীন।

আলোচ্য গবেষণাটি ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেলের দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপর সমীক্ষা চালিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক এবং মানুষের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে এই ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এছাড়া, পরিষদের বিভিন্ন সমস্যা, সদস্যদের সমস্যা, সাধারণ জনগণের সমস্যার কথা উল্লেখ করে সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে সরকার ও নীতি প্রণয়ণকারীরা যুযোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পটি ভিত্তি নির্মান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মোগল যুগ, ইংরেজ আমল এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সব

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার মাধ্যমেই স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় সরকারের পূর্ণ ইতিহাস না জানালে এর সমস্যা উদঘাটন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। আর সে কারণেই বিভিন্ন সময় গড়ে উঠা স্থানীয় সরকারগুলোর বিস্তৃত অ্যালোচনার পাশাপাশি সরকার গৃহীত পদক্ষেপ গুলি তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ের বিষয়কে মোট পাঁচটি ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন, ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকার ও প্রশাসনের প্রভাব, গ্রাম সরকার, গ্রাম উন্নয়নে এনজিও ভুমিকা ইত্যাদি।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিন্যাস ও পরিসংখ্যান ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ এ অধ্যায়ে ২০০৩ অনুষ্ঠিত ইউপি নির্বাচনের বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন, ইউপি নির্বাচন ও আচরণ বিধিমালা, ১৯৮৩, ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অধ্যাদেশের গুরুত্বপুর্ণ পরিবর্তনগুলি তুলে ধরে নির্বাচন পরবর্তী দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ঃ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে গণমাধ্যমের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে দেশের জাতীয় দৈনিক গুলোতে স্থানীয় সরকার বিষয়ক বভিন্ন সংবাদ কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয় তা নির্ণয় করা চেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল সমূহ পর্যালোচনা করে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শেষ অধ্যায়ঃ গবেষণা হতে প্রাপ্ত ফলাফল সমূহের ভিত্তিতে উপসংহার প্রণীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমাদের দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হয় মূলত ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে। নাগরিক নানা সমস্যার সমাধান, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন, কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোসহ বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা অপরিসীম। আজ একথা সর্বজন স্বীকৃত যে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হলো গণতন্ত্র ও সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত। অথচ বাস্তবে দেখা যায় বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদগুলো উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখছে না। তাই আমি **"বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা।"** শীর্ষক গবেষণা কর্মটি শুরু করি। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে থেকে গবেষণা কর্মটি শেষ করতে হয়েছে বলে কিছু ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। এ জন্য আমি সকলের নিকট আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থী। বর্তমান গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে সম্পন্ন করা হয়। গবেষণা কর্মটি শুরু করার পর হতে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পেয়েছি।

এক্ষেত্রে আমি প্রথমেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক দিলরওশন জিন্নাত আরা নাজনীন আপার কাছে। তার সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এই গবেষণা কর্মটি আমার পক্ষে শেষ করা কখনও সম্ভব হতো না। বিশেষ করে আমি যখন তত্ত্বাবধায়ক পাচ্ছিলাম না, সেই সময় আপা আমাকে গাইড দেওয়ার সম্মতি জানানোর ফলেই আমি গবেষণা কর্মটি করার সুযোগ পাই। তাই আপার কাছে আমি আন্তরিক ভাবে ঋণী। আমি বিভিন্ন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ডঃ নুরুল আমিন ব্যাপারী, প্রফেসর এম.সাইফুল্লাহ ভুইয়া, গোবিন্দ চক্রবর্তী, প্রফেসর ডঃ হারুনুর রশীদ এর কাছ থেকে যে মতামত পেয়েছি তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ তালেম চন্দ্র বর্মন বিভিন্ন সময় আমাকে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন যে জন্য তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আবুজর গিফারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিরীন

Dhaka University Institutional Repository

আপা, রোখসানা আপা ও জিন্নাত আপাকে, যারা আমাকে সব সময় সাহস ও উৎসাহ জুগিয়েছে।

এছাড়া বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি কবি বন্ধু মোঃ জাহাঙ্গীরের প্রতি, এছাড়া ধন্যবাদ জানাচ্ছি লিয়াকত, জিয়া, শিরীন, আতিক ভাই, নাজনীন এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিভাগের এম ফিল গবেষক শেখর কান্তিকে।

গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রী গ্রন্থাগারে আমাকে যেতে হয়েছে। গ্রন্থাগারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করে গবেষণা কর্মটি শেষ করতে সহায়তা করেছে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা জেলার দক্ষিণাগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য, মহিলা সদস্য এবং ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ সাক্ষাৎকার ও তথ্য দিয়ে গবেষণা কাজকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। তাঁদেরকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সবশেষে আমার গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যদি সামান্য অবদান রাখতে পারে তবেই আমার পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় — মারুফ আহমেদ

ফেব্রুয়ারী, ২০০৫ খৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ও গবেষণা পদ্ধতি

ভূমিকাঃ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততার প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশ স্বাধীন হয়েছে অনেক বছর অথচ এখানে কার্যকর স্থানীয় সরকার কাঠামো সঠিক ভাবে গড়ে ওঠেনি। ফলে আমরা এখানে শুধু ভাঙ্গা গড়ার খেলাই দেখতে পাই। স্বাধীনতার পর প্রতিটি সরকার এখানে আমলা নির্ভর হওয়ার কারণে আমলারা কার্যকর স্থানীয় সরকার গঠনে বাধা প্রদান করে আসছে। একের পর এক সরকার এখানে শুধু নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে এসেছে। অথচ আজকের দিনে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রয়োজন এ জন্য যে, দুনিয়া জোড়া আজ গণতন্ত্রের বিকাশ সমাজ জীবনে অপরিহার্য হয়ে দাড়িয়েছে। আজ প্রশাসন বলতেই সারা পৃথিবীতে উন্নয়ন প্রশাসন বোঝায়। আর এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় অংশ্রগহণের প্রশ্নটি তাই আজ সর্বমহলে খুবই গুরত্ব পেয়েছে। উন্নয়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। এক কথায় বলতে গেলে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ছাড়া উন্নয়নে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত হবে না। আর জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোন উন্নয়নই গণতন্ত্রকে সমাজ জীবনে প্রথিত করবে না। তাই গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং আধুনিক উন্নয়ন প্রশাসনের স্বার্থেই শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

অথচ উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আমলাতন্ত্রের উপর সব সময় নির্ভরশীল থাকে (Palombara, 1963:3-33)। আমলাতন্ত্রের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ার কারণে স্থানীয় পর্যায়ে যতটুকু উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পিছিয়ে পড়ছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানকার স্থানীয় সরকার গুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কারণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সমূহ গণতন্ত্রের শিক্ষাক্ষেত্র । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্থানীয় সরকারগুলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্ব স্ব দেশে অবদান রেখে চলছে (Hicks, 1961:1-9)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকা সত্ত্বেও আধুনিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর গ্রামে এর কোন কার্যকর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। দীর্ঘদিনের শোষণ, বঞ্চনা ও অবহেলার ফলে গ্রামগুলো স্বশাসিত স্থানীয় সরকার কাঠামো ধরে রাখতে পারছেনা। কেন্দ্রীয় শাসনের নিয়ন্ত্রণে থেকে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাতে জনগণের সম্পৃক্ততা নেই। অথচ স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণ ব্যতীত স্থানীয় উন্নয়ন অসম্ভব ব্যাপার। শাসনকার্যে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে পারলেই উন্নয়ন তরান্বিত ও সুনিশ্চিত হতে পারে।

পৃথিবীর সকল স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে সে দেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। কারণ এ পর্যায়েই দেশের জনগণ বিপুলভাবে জন কল্যানমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে থাকে। ইংল্যান্ডে 'কাউন্টি সিস্টেম' বহু পুরাতন স্থানীয় নির্বাচিত সরকার সংস্থা। এখানকার কাউন্টি কর্তৃপক্ষকে জাতীয় তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যে দানের ব্যবস্থা আছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বা পদ্ধতিতে সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নিমিত্ত স্থানীয় কমিশন রয়েছে। ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে কাউন্টি কাউন্সিলের কার্যাবলী বহুবিধ এবং গুরুত্বপূর্ণ। সেই তুলনায় এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ শুধু বাতুল নয়। নিরর্থকও বটে। চীনের 'কমিউন' ব্যবস্থাও অভূতপূর্ব। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশটির গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রশাসনের সর্বনিম্নস্তর কমিউন করে থাকে। উৎপাদন, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি 'উৎপাদক-ব্রিগেড' এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটাই সেখানকার কমিউন পদ্ধতির ভিত্তি (আসাদুজ্জামান,১৯৯৯:১৫-১৭)। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ প্রশাসন মানেই সর্বোচ্চ বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন। অখন্ড রাশিয়ায় যে সোভিয়েত ব্যবস্থা চালু ছিল, যার বদৌলতে ইউরোপের এককালের সবচেয়ে পশ্চাদপদ রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং একটি বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন থাকার কারণেই (ইসলাম,২০০২:৭)। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের পশ্চিম বাংলাতে সরকার একটি দীর্ঘকালীণ স্থিতিশীল সরকার; সেই সরকারের স্থিতির পেছনে মূল কারণ হলো সেখানকার বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থা যার নাম হলো পঞ্চায়েত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে নিতান্ত দরিদ্র। তেল, কয়লা, লোহা ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের পরিমান এখনও পর্যন্ত নিদারুনভাবে সীমিত। অর্থনীতি পুরোপুরি কৃষিনির্ভর। খামার ব্যবস্থায় আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার প্রায় অনুল্লেখযোগ্য। অথচ দেশের আয়তন ও সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমান সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্য। জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ ভাগ লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং কৃষি ও কৃষিনির্ভর কার্যাবলীর উপর নির্ভরশীল। অথচ বাংলাদেশের বাজেটে শতকরা ৮৫ ভাগ গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জন্য গড়ে ১১ ভাগ অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকে, শহরাঞ্চলের বাদবাকী শতকরা ১৫ ভাগের জন্য অর্থ বরাদ্দ থাকে শতকরা ৮৯ ভাগ। কাজেই বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য এখন থেকে রাষ্ট্রীয় বাজেটের সিংহভাগ গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ করা দরকার (আসাদুজ্জামান,১৯৯৯;১৬)। কারণ, দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোকের উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে গ্রামেই ফিরে যেতে হচ্ছে এবং এই শতকরা ৮৫ ভাগ লোককে তাদের 'নিজস্ব অবস্থান' গ্রামে রেখেই তাদের আর্থিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক সর্বরকম উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ জন্য দরকার গ্রামঞ্চল শক্তিশালী সংগঠনের। এ কারণে শহরাঞ্চলে অপেক্ষা বাংলাদেশের গ্রামঞ্চলকেই উন্নয়ন কর্মধারার শীর্ষে নিয়ে আসতে হবে এবং নানা উৎপদনমূলক কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত শহরমুখী কর্মজীবি, নিরন্ন মানুষের স্রোত বন্ধ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

যদিও দেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫৫ ভাগ কৃষি এবং গ্রাম বাংলা থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু এ দুখাতে সে পরিমানে বিনিয়োগ করা হয় না। বাংলাদেশের বাজেটে দেশের শতকরা ৮৫ভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য গড়ে ১১ ভাগ অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা থাকে, বাকী ১৫ ভাগের জন্য বরাদ্দ হয় ৮৯ ভাগ। গ্রাম থেকে প্রতিনিয়ত শহরে সম্পদের পাচার হচ্ছে। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্রতা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, ক্ষুধা, অপুষ্টি, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের নানাবিধ হয়রানি ইত্যাদি অসুবিধার মধ্যে বাস করছে। এ সমস্ত অসুবিধার অনেক কারণের মধ্যে বিশেষ কারণগুলো হল (ক) উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতার কেন্দ্রীভুতকরণ এবং (খ) কোম্পানীর আমল থেকে গ্রামবাংলার সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচার। এই পাচার ও লুণ্ঠন বোধকল্পে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে নিপিড়ীত বঞ্চিত মানুষের জন্য বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন (আসাদুজ্জামান, ১৯৯৯:৩৬-৩৭)। বাংলাদেশের উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের উন্নয়ন করা যাতে করে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রায় মান বৃদ্ধি পায়। ইউনিয়ন পরিষদই বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের দাবী

Dhaka University Institutional Repository

রাখে। কারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। ইউনিয়ন পরিষদের সাথে গ্রামীন জনগণের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক কারণ এর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল ধরে জড়িত আছে এ দেশের মানুষ। গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাই পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। গ্রামের উন্নতি ব্যতীত সামগ্রীক উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের উন্নয়ন করতে হলে গ্রামসমূহের উন্নয়ন প্রয়োজন সবার আগে (Haq,1973:18-19)। এদেশের অধিকাংশই কৃষিকাজ করে জীবীকা নির্বাহ করে। খাদ্য সমস্যা দেশের প্রধান সমস্যা, প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে আমাদের প্রচুর খাদ্য আমদানী করতে হয়। তাই কৃষির উন্নতি বিধান করা গ্রাম উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ (Miah,1976:3)। আমাদের সম্পদ অল্প কিন্তু জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। জনসংখ্যা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা। গ্রামের মানুষই পরিবার পরিকল্পনা কম গ্রহণ করেন। তাই জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য সঠিক পদক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাম উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারগুলোর অনেক কিছুই করার আছে (Raper,1970:114)। জন সাধারণের কল্যাণার্থের রাস্তাঘাট, কৃষি, শিক্ষা, জলসেচ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রাথমিক গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনা ঃ বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল দেশকে যদি অগ্রসর হতে হয় তবে অবশ্যই তৃণমূল পর্যায়কে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতায়ন না হলে প্রত্যন্ত এলাকায় যে সমস্যাগুলি রয়েছে তা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না। এজন্য বিষয়টি নিয়ে বার বার গবেষণা হয়েছে। আমি এজন্য জরুরী বিষয় হিসেবে গবেষণার জন্য এ বিষয়টিকে বেছে নিয়েছি। তবে আমার গবেষণার ক্ষেত্র একটু ভিন্ন। পূর্বে যাদের গবেষণা আলোচনা হয়েছে তাদের গবেষণার উপর কিছুটা আলোকপাত করা হলো।

M.K Alamgir, রচিত Development Strategy for Bangladesh গ্রন্থে লেখক গ্রাম উন্নয়নের উপর আলোচনা করেছেন। তিনি তার আলোচনায় গ্রামীন এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। গ্রাম উন্নয়নের জন্য যে ধরনের কার্যকর প্রশাসন প্রয়োজন তা তিনি আলোচনা করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

Hasnal Abdul Hye এর Decentralization Local Institution and Resource Mobilization' গ্রন্থে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর আলোচনা করেছেন। তার আলোচনায় বিভিন্ন দেশের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া। স্থানীয় সরকারগুলোর সাফল্য ও ব্যর্থতা আলোচনা করে সর্বশেষে কিছু সুপারিশ করেছেন। তবে তিনি বিকেন্দ্রীকরণকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত করে দেখেননি।

Dr. Amirul Rahman তার Ruaal Local Self Government in Bangladesh প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশের অধীন ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা মূলায়ন করেছেন।

Lutful Haque Chowdhury তার "Local self Government and its reorganization in Bangladesh" প্রবন্ধে স্থানীয় সরকারের প্রকৃতি এর উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

কামাল সিদ্দিকী, তার Local Government in Bangladesh" গ্রন্থে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। তার আলোচনায় স্থানীয় সরকারের বিবর্তন, গঠন, কাঠামো, কার্যাবলী, প্রশাসনের বিভিন্ন সমস্যা ফুটে উঠেছে। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের সাথে অন্যান্য দেশের স্থানীয় সরকারের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। পরিশেষে তিনি বাংলাদেশের জন্য একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার চালু করার সুপারিশ করেছেন।

Harold F. Alderfer রচিত Local Government in Development Countries গ্রন্থে লেখক এশিয়ার বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে ধারনা দিয়েছেন। তার আলোচনায় বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণার গুরুত্বঃ ১৮৭০ সালে গ্রাম উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইউনিয়ন পরিষদ ধারণার সূত্রপাত হলেও গ্রাম-গঞ্জের বেশির ভাগ মানুষ এখনও এর সুফল পায়নি। দুর্ভোগ দুর্গতির বোঝা নিয়ে বেঁচে আছে গ্রামীন জনগপদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত তারা। তাদেরকে নির্যাতন-নিপীড়ণ সইতে হচ্ছে। তবে বিভিন্ন সময়ে এর কার্যক্রম ও কাঠামোর পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু গ্রাম-গঞ্জের মানুষের ভাগ্যে সুফল পড়েছে সামান্যই।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ধাপ হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। এই স্ত রটি স্থানীয় জনগণের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। এই স্তরের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে ও নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জনগণের পক্ষে ব্যাপক হারে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহন যতটা সহজ, অন্য কোন স্তরে ততটা সহজ নয়। তাই ইউনিয়ন পরিষদগুলো দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় সেখানকার স্থানীয় সরকারগুলো বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে কিন্তু আমাদের দেশে বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে। গ্রাম প্রধান এবং কৃষিভিত্তিক ও গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর আমাদের দেশে স্থানীয় সংস্থা ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত বেশী এ কারণে যে, গ্রামের উন্নয়ন ছাড়া এ দেশের উন্নয়ন এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়।

দেশের এবং বিশেষ ভাবে বলতে গেলে গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের তথা গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন সাধন, দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষাদীক্ষার বিস্তার, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মানবিক উন্নয়ন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা চালানো সরকারের প্রধানতম দায়িত্ব। গণতন্ত্র চর্চার এবং গণতান্ত্রিক শাখা ব্যবস্থার প্রথম সোপান বা সংস্থা হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম প্রধান ও গ্রামীন অর্থনীতি নির্ভর বাংলাদেশের তথা গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন মুখী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী সমূহ বাস্তবায়নে সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা প্রদান ছাড়াও স্থানীয় সংস্থা হিসাবে নিজস্ব বিভিন্ন কর্মসচূী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারে । স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রশাসনিক দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পাদন করার কর্মটিই সম্পাদিত হয় না। স্থানীয় পর্যায়ের অর্থাৎ তৃণমূল পর্যায় থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকাশও ঘটে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন পরিকল্পনা তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়ন, উন্নয়ন গতিধারাকে সুসংহত করণ এবং স্থানীয় জনগণের সমস্যা সম্পদ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে জাতীয় পর্যায়ে এর প্রতিফলন ঘটানোর গতানুগতিক ধারাকে অব্যাহত রাখতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অবদান অনস্বীকার্য। (আলী, ১৯৯৯, ১১)

বর্তমান স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং পরবর্তী এর সংশোধনী সমূহ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য আইনগত কাঠামো প্রদান করেছেন। এছাড়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও সার্কুলারের মাধ্যমে এই আইনকে আরো সমন্বিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। তবে ১৯৮৩ কার্যাবলীতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে; যেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা সীমিত, ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী পুরুষের সমভাবে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে নারী সদস্যেদের দায়িত্ব না থাকা, নারী সদস্যদের কাছে সংবাদ ও তথ্য সরবরাহের অপ্রতুল ব্যবস্থা, নারীর চলা ফেরার নিরাপত্তার ঘাটতি ও অসম অবস্থান, নারী সদস্যদের প্রশিক্ষণের অভাব এবং প্রশাসক ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নারী বিষয়ক জ্ঞানের অভাব।

অথচ ইউনিয়ন পরিষদের ওপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কমিউনিটির উন্নয়নের ব্যাপক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের ৩০ (২) ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের দশটি বাধ্যতামূলক কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অধ্যাদেশে উল্লেখিত ইউনিয়ন পরিষদের ওপর ন্যস্ত কাজের পরিধি ও দায়িত্ব ব্যাপক এবং সেগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন যথেষ্ট যোগ্যতা, ক্ষমতা ও সম্পদের দাবি করে। ন্যস্ত কতিপয় দায়িত্বকে গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর অনেকগুলোই ইউনিয়ন পরিষদের আইনগত কাঠামো ব্যবস্থাপন এবং আর্থিক সামর্থ্যে মধ্যে পড়বে না (আমিনুজ্জামান, ২০০৪:২)। ইউনিয়ন পরিষদের কাজের মূল তালিকা প্রণীত হয়েছিল আজ থেকে ৪০ বছর আগে একনায়কতান্ত্রিক ও উপনিবেশিক সরকারের আমলে (Basic Democracy Order) ১৯৫৯ এর মাধ্যমে। পরিবর্তিত বাস্তবতার আলোকে এর অনেকগুলো এখন সেকেলে ও দৃশ্যত অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। পরিবর্তিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার আলোকে ইউনিয়ন পরিষদের ওপর বর্তিত এই বিশাল কাজের তালিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের নীতি সংক্রান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের কার্যত কোন কর্তৃত্ব নেই। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের অধিকাংশ ক্ষমতাই সরকারের হাতে রেখে দেওয়া হয়েছে।

তাই এই ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের উপর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কিভাবে এটিকে জনগণের কাছে গ্রহণ যোগ্য করা যায়, এর ত্রুটি বিচ্যুতি, প্রশাষণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মানসিকতা, প্রশাসনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, এর বর্তমান কার্যাবলী পর্যালোচনা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সীমাবদ্ধতা নির্ণয়।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ যে কোন গবেষণার সূচনা হয় একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করে। আমার আলোচ্য এ গবেষণার শিরোনাম সমস্যার সমাধানের আলোকে উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যে পৌছার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করতে আলোচ্য গবেষণাটুকু রচিত হয়েছে। আমার এ গবেষণার বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে। আমি মনে করি তৃণমূল পর্যায়ে প্রকৃত ক্ষমতায়ন ছাড়া কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌছতে পারেনি ঠিক তেমনি তৃণমূলকে কেন্দ্র করেই আলোচ্য গবেষণাটুকু রচিত হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণায় বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করাই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি বাংলাদেশের ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেলের দুইটি ইউনিয়নের উপর পর্যাবেক্ষণ চালিয়ে বর্তমান অনুসৃত নীতির ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়া গবেষণার মূল উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

প্রস্তাবিত গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপঃ

১। ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার বর্তমান ভূমিকার মূল্যায়ন;

২। মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা নির্ণয়;

৩। নির্ধারিত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা ও সুষ্ঠ সমাধানের উপায় খুজে বের করা;

Dhaka University Institutional Repository

৪। পরিষদের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মাঝে বিদ্যমান বিভিন্ন বৈষম্য সম্পর্কে আলোকপাত করা;

৫। ইউনিয়নের উন্নয়নে পরিষদ সদস্যগণ যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করা;

৬। পরিষদ সম্পর্কে স্থানীয় জনসধারণের মনোভাব যাচাই করা;

৭। ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার সাফল্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা;

প্রবন্ধে উপস্থাপিত প্রত্যয়সমূহঃ বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি প্রত্যয় আছে যেগুলোর সংক্ষিপ্ত ধারণা বিষয়বস্তুটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝাতে সহায়তা করবে।

স্থানীয় সরকার ঃ স্থানীয় সরকারের অর্থ হল সুষ্ঠুভাবে কার্যপরিচালনার জন্য গোটা এলাকাকে বিভক্ত করে যে শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয় তাকে স্থানীয় সরকার বলে। স্থানীয় শাসনের ধারনা দুইটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত! কোন গণতান্ত্রিক জনসমষ্টি তাদের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলবে; দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকমের স্থানীয় প্রয়োজন বা চাহিদা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে প্রত্যেক স্থানীয় সম্প্রদায়কে আত্মশাসনের ক্ষমতা দিতে হবে। বস্তুত গণতন্ত্রকে সজীব ও সাফল্যমন্ডিত করা এবং স্থানীয় সমস্যাবলীর সঠিক সমাধানে বের করাই স্থানীয় শাসনের মূল লক্ষ্য।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক ই,এল হ্যাজলাক বলেন If some local body has it in its power to governmen in a different manner from the other bodies, there we have local government(Hasluck, 1980:P.6)। অর্থাৎ স্থানীয় সরকার সেই সব কার্যাবলী করে থাকে। যেগুলি বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ এবং এলাকাটি সমগ্র দেশের তুলনায় ক্ষুদ্র।

অন্য কথায় বলা যায় যে স্থানীয় সরকার হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত এখন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা যা স্থানীয় বিষয়াবলী দেখা শুনা করে থাকে এবং করা রোগসহ যথেষ্ট কর্তৃত্বের অধিকারী।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নঃ উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তনেরই ফলস্বরূপ। পরিবর্তনের সাথে উন্নয়ন বিষয়টি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কোন সমাজ যে বিষয়ে যতটুকু পরিবর্তন সাধিত হবে সেই সমাজ ঐ বিষয়ে ততটুকু উন্নয়ন সাধিত হবে। পরিবর্তনের গতি বৃদ্ধি পেলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে। আর পরিবর্তনের গতি মন্থর হলে উন্নয়নের গতি স্থির হয়ে যাবে। এভাবে বলা যায়, পরিবর্তন হচ্ছে উন্নয়নের ফল।

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে বহু পরিবর্তন আসে। বিশেষতঃ চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যে প্রকৌশলগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানব সভ্যতার পুরো ইতিসহাসেও তা হয়নি। একই সাথে এসেছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশীর ভাগ দেশ যখন ঔপনিবেশিকতার, শৃঙ্খল ভেঙ্গে একে একে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিল, তখন এসব দেশের সামনে প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এর পরবর্তীতে একদিকে যেমন উন্নয়ন অর্থনীতির তত্ত্বীয় দিক থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ঠিক তেমনি সম্ভাব্য উন্নয়ন নীতির ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও নানান ধরনের ধারণা জন্ম লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মোট জাতীয় আয়ের ৬ষ্ঠ প্রবৃদ্ধির হারকেই সমার্থক বলে মনে করা হয় (জাহান, ১৯৮৯ঃ ৭-৮)। উন্নয়নের সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। কারণ সাধারণভাবে উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বুঝানো হয়। কিন্তু উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য আছে। জার্মান অর্থনীতিবিদ সম্পিটার (১৯৩৪) এর মতে প্রবৃদ্ধি হলো একই পদ্ধতি অনুসরণ করে একই ধরণের উৎপাদনের সম্প্রসারণ। কিন্তু উন্নয়ন হলো উৎপাদন উপকরণ সমূহের নতুন নতুন সমন্বয়করণ। নতুন উৎপাদন পরিস্থিতি, নতুন পণ্য উৎপাদন, নতুন সরবরাহ উৎসের সন্ধান। নতুন বাজার ও শিল্পের আগমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। কিন্তু উন্নয়ন শব্দটি আরো ব্যাপক। শুধুমাত্র অর্থনীতি এর নির্ধারক নয়।

১৯৭৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক overseas Development council এর উদ্যোগে ডেভিড মরিস উন্নয়নের এক নতুন ধারণা দেন- যা জীবনের ভৌত মান সূচক (Physical quality life index or PQLI) হিসেবে পরিচিত। তিনটি সূচকের সমন্বয়ে PQLI গঠিত। (১) একজন মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুস্কাল (২) শিশু মৃত্যুর হার; এবং ৩১ শিক্ষার হার।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯০ সালে ইউ এন ডি পি'র উদ্যোগে পাকিস্তানের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুবুল হক উন্নয়নের সূচকের এক নতুন ধারণা- দেন যা মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) বা HDI নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি অর্জন করেছে। HDI তিনটি সূচক নিয়ে গঠিত, যথাঃ- (১) মানুষের গড় আয়ুষ্কাল; (২) শিক্ষার হার; এবং (৩) ক্রয় ক্ষমতা। বর্তমানে HDI পরিমাপ করা হচ্ছে অনেকগুলো উপাদানের সমন্বয়ে, যথাঃ- আয়ুস্কাল, শিক্ষা, খাদ্য ও পুষ্টি, আয়, মহিলা ও শিশুদের অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি (আলর্ম, ১৯৯৭:৩০)।

Gunner Myrdol এর মতে "Development means improvement of the host of undesirable conditions in the social system that have perpetuated a state of under development, (Myrdal, 1972:30).

উন্নয়নের অভিধানিক অর্থ অনেকটা উদ্দেশ্যবাদী এ অর্থে উন্নয়ন হচ্ছে পরিপূর্ণতা। কেউ বলেন উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তন। অন্যদের মতে এটা বাস্তব প্রবৃদ্ধি (নূর ২০০০:১০৯-১১০)। আবার কেউ বলেন উন্নয়ন হচ্ছে একই সাথে পরিবর্তন ও প্রবৃদ্ধি।

Hooguelt বলেন, the world development has become tantamiunt to planning, to the deliberate engineering of processes of internal societal dynamics, of growth and change. Note the distinction between government and society. To date 'development' is still very much an elitist ideology a conscious effort and a pledge on the part of governments to achive predetermined goals. Note secondly that the formulation of thes goals is thirst of all economic referring to an improvement in the material standards living of the people (Ankie, 1988:149).

অর্থনীতির দিক থেকেও অনেকে উন্নয়নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। তাদের মতে যে সমাজ বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তথা জনগণের উপভোগের চরম পর্যায়ের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হয়েছে যে সমাজ উন্নত। (Rostow, 1960: 12). জাতিসংঘ কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত এক গ্রন্থে উন্নয়ন বলতে এমন এক ধারা বুঝিয়েছেন যার মাধ্যমে জনগণ তাদের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারে। উন্নয়ন সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কারণ উভয়ই তাদের নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে থেকেই উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করতে চেয়েছেন। আজকের অনুন্নত বিশ্বে যেখান শতকরা ৯০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক মানবেতর জীবন যাপন করছে। যেখানে উন্নয়ন মানে সনাতন কোন প্রবৃদ্ধির সূচক জাতীয় কিংবা মাথাপিছু আয় হতে পারে না। সেখানে উন্নয়ন মানে অভিজাত নগর কেন্দ্র হতে পারে না কিংবা সেখানে উন্নয়ন মানে মর্যাদাসূচক প্রকল্পের দ্রুত বিস্তার হতে পারে না। অনুন্নত দেশ সমূহের বর্তমানের দেয় আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের একটি এবং কেবল মাত্র একই সংজ্ঞাই গ্রহন যোগ্য এবং তা হচ্ছে উন্নয়ন মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ন্যূন্যতম মৌলিক চাহিদা পূরণ (জাহান, ১৯৮৯ঃ৭-৮)। সুতরাং আজকে একটি দেশের জাতীয় বা মাথাপিছু আয় বাড়ল কিংবা তার শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটেছে কিনা কিংবা তথাকথিত উন্নয়ন স্তরের কোন স্তর পার হচ্ছে তার দ্বারা যে দেশের উন্নয়ন সূচীত হতে পারে না। আজ একটি দেশের উন্নয়ন স্তর নির্ণীত হবে তার দেশের শতকরা কতজন লোকের ন্যূনতম মৌলিক মানবিক চাহিদা পুরণ করতে পারছে তার উপর।

উপরোক্ত ধারনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উন্নয়ন হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা মানব জীবনে সার্বিক পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়। তবে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে উন্নয়নের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

বিকেন্দ্রীকরণ ঃ বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে কেন্দ্র নির্ভর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে বের হয়ে আসার একটা উপায়। কেন্দ্র থেকে দূরে থাকার এই বিষয়টি কোনো আইন। প্রকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন এবং অবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট হতে পারে। বিকেন্দ্রীকরণ বলতে সরকারের উচ্চতম পর্যায় থেকে নিম্নতম পর্যায়ে আইন প্রণয়ন বিচার সংক্রান্ত বা প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর বুঝায়।

বিকেন্দ্রীকরণ জবাবদিহিতা বাড়ায়, শাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এবং জনগণের প্রশাসনের কাছাকাছি এনে দেয়। এর ফলে স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ত্বরান্বিত করা যায়। স্থানীয় প্রশাসনগুলোর ক্ষমতায়ন হয় এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসক

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে তাদের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিতে পারে। Cheems এবং Rondinelli চার ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন (cheema and Randinelli, 1963:18) । যথাঃ-

(১) বিপুঞ্জীভূত করণ

(২) প্রতিনিধি প্রেরণ

(৩) ক্ষমতা বেষ্টন

(৪) বিচ্ছিন্নতা করণ

আপহফ (Uphoff) এর মতে বিকেন্দ্রীকরণ হচ্ছে একটি অবশেষ সংক্রান্ত শ্রেণী যার আওতায় পড়বে যেটি কেন্দ্রীকরণ নয় এরকম প্রত্যেকটি জিনিষ (Uphoff, 1985:33)।

মাইহুদ (Mawhood) প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছেন একটি সংকীর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত সুনির্দিষ্ট অর্থে সরকারের নিম্নতর স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তর বোঝাতে (Mawhood,1985:112)। তার মতে বিকেন্দ্রীকরণের আওতার মধ্যে পড়ে এমন একটি স্থানীয় সরকার এককের সৃষ্টি যার আছে একটি নিজস্ব বাজেট ও পৃথক আইনগত অস্তিত্বের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মের বিস্তৃতিতে উল্লেখযোগ্য কর্তৃত্ব। তাছাড়া বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের একাধিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যদি এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য না থাকে বা দুর্বলভাবে উপস্থিত থাকে তবে এই প্রশ্ন উঠবে যে, এটি কি একটি বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামো নাকি বিপুঞ্জীভূতকৃত কাঠামো। মাইহুদ তাঁর মডেলে কতগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের তালিকা দিয়েছেন যার দ্বারা বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে কিনা তা বোঝা যায়। (রহমান ও সিদ্দিকী, ১৯৯৭ঃ৬৩-৬৪)।

সারণী ১.১ঃ চিত্রঃ বিকেন্দ্রীকরণ ও বিপুঞ্জীভুতকরণের পার্থক্য

সম্পৃক্ত প্রত্যয়গুলি	বিপুঞ্জীভূতকরণ	বিকেন্দ্রীকরণ
জনগণকে সংগঠিত করা	বিপুঞ্জীভুতকরণ (ফরাসী লেখক)	বিকেন্দ্রীকরণ (ফরাসী লেখক)
	বিপুঞ্জীভূতকরণ (জাতিসংঘ রিপোর্ট	ক্ষমতা হস্তান্তর (জাতিসংঘ রিপোর্ট)
	আমলাতান্ত্রিক	গণতান্ত্রিক
	বিকেন্দ্রীকরণ	বিকেন্দ্রীকরণ
	প্রশাসনিক	রাজনৈতিক
	বিকেন্দ্রীকরণ	বিকেন্দ্রীকরণ
যে কাঠামোর মধ্যে নীতিটি আধিপত্যশীল	মাঠপর্যায়ের প্রশাসন	স্থানীয় সরকার
	আঞ্চলিক প্রশাসন	স্থানীয় স্ব-শাসন
	প্রিফ্যাক্টরাল প্রশাসন	পৌর প্রশাসন
চর্চা	ক্ষমতা অর্পণ	ক্ষমতা হস্তান্তর

L.D. White বলেন, The process of transfer of authotity, from a lower to a higher level of government is called centralisation, converse is decentralisation. (white, 1960:37)

সব শেষে বলা যায় বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই দেশের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বণ্টিত হয়। এই সব স্তরকেই আমরা বলি স্থানীয় সরকার। দেশের সামগ্রীক উন্নয়নের জন্য আবশ্যক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের আর স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কেবল তা সম্ভব।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনঃ স্বায়ত্তশাসন বলতে স্ব-শাসন বা নিজেদের শাষণকে বোঝায়। এই ব্যবস্থার মুল কথা হল স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা কোন অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা পরিচালন

করা। প্রত্যেক দেশেই জেলা মহকুমা। গ্রাম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল থাকে। স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা এই সমস্ত অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনার ব্যবস্থাকে স্বায়ত্ত শাসন বলে। স্বায়ত্তশাসন হল স্থানীয় মানুষের দ্বারা আঞ্চলিক শাখা পরিচালনা।

J. Clarke; এর মতে, ...that part of the government of a nation or of a state deals mainly with such matters as concern the inhabitants of a particular district or a place and which should be administered by the local authorities subordinate to the central government (Clarke, 1960:P.1)

অর্থাৎ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় এবং স্বীয় প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়।

জনগণের অংশগ্রহণঃ উন্নয়ন কর্মাকান্ডে জনগণের অংশগ্রহন কথাটি বেশ ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। দেশের আপামর জনসাধারণ যখন স্বতঃস্ফুর্তভাবে অথবা কারো দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে জনগণের অংশগ্রহণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বাংলাদেশের সচেতন সমাজের কাছে এখন একটি বিষয় অত্যন্ত গ্রহনযোগ্য এবং তা হচ্ছে সুশাসন নিশ্চিত করতে হলে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। আর তা করতে হলে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো। বাংলাদেশের চলমান স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার দেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও কাঠামোগত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে 'অংশগ্রহণ' কে একটি বৃহৎ পরিসরে পৌঁছে দিয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রশাসন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে। আর তাই উন্নয়নে সরকারি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ সামাজিক, অর্থনৈতিক থেকে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে পড়ছে (নার্সরিন, ২০০০ঃ৩)। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণকে অন্যতম নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার সমূহ বিভিন্ন সময় প্রশাসনিক সংস্কার করেছে। এ সংস্কারগুলো করা হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্যতা এবং

আর্থ সামাজিক সমস্যা দূর করার জন্য। কিন্তু যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংস্কার করা হয়েছে বাস্তবে তা সফলতা আনতে পারেনি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামীলীগ প্রথম সরকার গঠন করে এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর জোর দেয়। সরকার জেলা পর্যায়কে শক্তিশালী করার জন্য মহকুমাগুলোকে জেলায় উন্নিত করে জেলা স্তরে জেলা গভর্ণর নিয়োগ করে। কিন্তু গভর্ণরের সিদ্ধান্তের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও সামরিক প্রতিনিধিদের ছিল না। তাই এই ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ কতোটুকু নিশ্চিত করা যেতো সে বিষয় নিয়ে বিতর্ক ছিল।

১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে ত্রিমুখী শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থায় সরকারের হাতেই তত্তাবধায়ন ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। ১৯৮০ সালে স্ব-নির্ভর গ্রাম সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয় কিন্তু বাস্তবে গ্রাম সরকার কোন দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। কারণ তাদের নিজস্ব কোনো রাজস্ব ছিল না। এছাড়া সরকারী দলের প্রতিনিধিরাই এর নেতৃত্ব দিত এবং ক্ষমতার ব্যবহার করতো। ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ প্রশাসনিক পুনর্গঠন ও সংস্কার কমিটির সুপারিশক্রমে স্থানীয় উন্নয়নের জন্য ৪৬০টি থানাকে উপ-জেলায় উন্নীত করে। উপজেলা ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনলেও স্থানীয় উৎস থকে তহবিল সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। এছাড়া দুর্নীতি এতো ব্যাপক আকার ধারণ করে যে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সরকারি কর্মকর্তারা জনগণের অর্থের অপব্যবহার করে। বিভিন্ন পর্যায় থেকে এই ব্যবস্থা সমালোচিত হতে থাকে যা সরকারের পতনকেও ত্বরান্বিত করে।

১৯৯১ সালে এরশাদের পতনের পর খালেদা জিয়ার সরকার দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ ব্যবস্থা চালু করে। তাছাড়া সরকার থানা উন্নয়ন কমিটি গঠন করে। এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ হয়ে কাজ করতো বলে বিকেন্দ্রীকরণের গণতান্ত্রিক রূপটি পায়নি তাই এখানেও জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি।

তবে স্থানীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়েছে। বর্তমানে সরকারও নারী ভিত্তিক বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করছে। এই পরিবর্তন

নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। যে কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। আর সে সত্য উপলব্ধি করেই উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সরকারও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। তথাপি গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন থেকে বাংলাদেশ এখনো অনেক দূরে।

গবেষণার ক্ষেত্র ঃ আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। একজন গবেষকের পক্ষে এত বিশাল পরিসরে কাজ করাও অসম্ভব। কারণ এতে গবেষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে। আর সেজন্য আমি বাংলাদেশের ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেলের দুইটি ইউনিয়ন পরিষদ গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছি। তেজগাও সার্কেল ২৩টি থানা ১৭টি ইউনিয়নের সমম্বয়ে গঠিত। তেজগাও সার্কেলের অধীন সবুজবাগ থানার অন্তর্গত দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন ও খিলগাও থানার অন্তর্গত নাসিরাবাদ ইউনিয়ন নির্বাচন করার কারণ হলো এ দুটো ইউনিয়ন আমার বর্তমান আবাস স্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। এছাড়া এ দুটো ইউনিয়নের জনগণ ও পরিষদ সদস্যদের সাথে আমার পুর্ব থেকে জানাশোনা রয়েছে। যা আমার গবেষণায় তথ্য সংগ্রহে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন ঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মোট আয়তন ০.১৭৮ বর্গমাইল। দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৪২,৮২০ জন। এর মাঝে পুরুষের সংখ্যা ২১.৭৩০ স্ত্রী লোকের সংখ্যা ২০.৮২৫ মোট ভোটার ২৩,১৯৯ এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১২,৫০৯ এবং মহিলা ভোটার ১০,৬৯০ জন। এই ইউনিয়ন মোট চারটি গ্রামের সমম্বয়ে গঠিত। গ্রামগুলো হচ্ছে দক্ষিণগাঁও (ডেমরা), দক্ষিণগাঁও, নন্দিপাড়া, মানিকদিয়া। এই ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে নিম্নভাবে।

সারণী ১.২ ঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা
১	পশ্চিম নন্দীপাড়া	৪	দক্ষিণগাঁও ১নং রোড নয়াবাগ, কুসুমবাগ	৭	বেগুন বাড়িয়া
২	মধ্যে নন্দীপাড়া	৫	দক্ষিণগাঁও ২নং রোড দাসপাড়া, মন্ডলপাড়া	৮	দক্ষিণ মানিকদিয়া
৩	পূর্বনন্দী পাড়া	৬	দক্ষিণগাঁও ৩নং রোড শাহীবাগ, পূর্বপাড়া	৯	উত্তর মানিকদিয়া

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

সারণী ১.৩ঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	ইউপি সদস্যদের নাম	সদস্যদের পদ মর্যাদা
১	দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান
২		মোঃ আজিজুল হক	সদস্য
৩		আব্দুল মান্নাফ	সদস্য
৪		মোঃ আলী আকবর মাতবর	সদস্য
৫		আঃ রাজ্জাক	সদস্য
৬		মোঃ ইউসুফ আলী	সদস্য
৭		আকবর হোসেন কামাল	সদস্য
৮		মোঃ নিজাম উদ্দিন	সদস্য
৯		মোঃ নুর হোসেন	সদস্য
১০		মোঃ আঃ মোত্তালিব	সদস্য
১১		মাহমুদা জামান	মহিলা সদস্য
১২		কুলসুম আক্তার	মহিলা সদস্য
১৩		রাশিদা বেগম	মহিলা সদস্য

নাসিরাবাদ ইউনিয়ন ঃ নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মোট আয়তন ০·১০৫ বর্গমাইল। ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ২৪,৭২০ জন। এর মাঝে পুরুষের সংখ্যা ১৩,৪৮০ স্ত্রী লোকের সংখ্যা ১১,২৪০ । ইউনিয়নের মোট ভোটার ৯,০৭৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৭১১ এবং মহিলা ভোটার ৪,২৮৪ জন।

সারণী ১.২ ঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা
১	পশ্চিম নন্দীপাড়া	৪	দক্ষিণগাঁও ১নং রোড নয়াবাগ, কুসুমবাগ	৭	বেগুন বাড়িয়া
২	মধ্যে নন্দীপাড়া	৫	দক্ষিণগাঁও ২নং রোড দাসপাড়া, মন্ডলপাড়া	৮	দক্ষিণ মানিকদিয়া
৩	পূর্বনন্দী পাড়া	৬	দক্ষিণগাঁও ৩নং রোড শাহীবাগ, পূর্বপাড়া	৯	উত্তর মানিকদিয়া

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

সারণী ১.৩ঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	ইউপি সদস্যদের নাম	সদস্যদের পদ মর্যাদা
১	দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ	মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান
২		মোঃ আজিজুল হক	সদস্য
৩		আব্দুল মান্নাফ	সদস্য
৪		মোঃ আলী আকবর মাতবর	সদস্য
৫		আঃ রাজ্জাক	সদস্য
৬		মোঃ ইউসুফ আলী	সদস্য
৭		আকবর হোসেন কামাল	সদস্য
৮		মোঃ নিজাম উদ্দিন	সদস্য
৯		মোঃ নুর হোসেন	সদস্য
১০		মোঃ আঃ মোত্তালিব	সদস্য
১১		মাহমুদা জামান	মহিলা সদস্য
১২		কুলসুম আক্তার	মহিলা সদস্য
১৩		রাশিদা বেগম	মহিলা সদস্য

নাসিরাবাদ ইউনিয়ন ঃ নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মোট আয়তন ০.১০৫ বর্গমাইল। ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ২৫,৭২০ জন। এর মাঝে পুরুষের সংখ্যা ১৩,৪৮০ স্ত্রী লোকের সংখ্যা ১২,২৪০ । ইউনিয়নের মোট ভোটার ৯,০৭৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৭১১ এবং মহিলা ভোটার ৪,২৮৪ জন।

১২টি গ্রামের সমন্বয়ে নাসিরাবাদ ইউনিয়ন গঠিত। গ্রামগুলো হচ্ছে ফকিরখালি, ইদারকান্দি, বালুর পাড়, বাবুর জায়গা, দাসের কান্দি, ত্রিমোহনী, লায়নহাটি, গৌড় নগর, নাসিরাবাদ, শেখের জায়গা, নাগদাড় পাড়, বাইগদিয়া। এই ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে নিম্নভাবে।

সারণী ১.৪ঃ নাসিরাবাদ ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ড

ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা	ওয়ার্ড নং	ওয়ার্ডভিত্তিক এলাকা
১	ফকিরখালি ইদারকান্দি	৪	ত্রিমোহনী পূর্ব পাড়া লায়নহাটি জোড়ভিটা	৭	গৌরনগর বটতলা বাগপাড়া
২	বালুর পাড় বাবুর জায়গা	৫	ত্রিমোহনী পশ্চিমপাড়া উত্তরপাড়া	৮	নাসিরাবাদ নাসিরাবাদ উত্তর পাড়া
৩	দাসের কান্দি-৩ নং ওয়ার্ড	৬	ত্রিমোহনী পশ্চিমপাড়া, ইসলামবাগ, নূরবাগ	৯	নাগদাড় পাড়া শেখের জায়গা, বাইগদিয়া।

উৎসঃ মাঠ জরীপ

সারণী ১.৫ ঃ নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	ইউপি সদস্যদের নাম	সদস্যদের পদ মর্যাদা
১	নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ	মোঃ আবুল হোসেন	চেয়ারম্যান
২		মোঃ আকরাম হোসেন	সদস্য
৩		মোঃ আলাল উদ্দিন	সদস্য
৪		মোঃ মতিউর রহমান	সদস্য
৫		আঃ মোবারক হোসেন	সদস্য
৬		মোঃ হিরুন মিয়া	সদস্য
৭		মোঃ আলমগীর হোসেন	সদস্য
৮		মোঃ ফাইজুদ্দিন	সদস্য
৯		মোঃ ফজলুল হক	সদস্য
১০		মোঃ আবদুর রউফ	সদস্য
১১		রোজিনা খাতুন	মহিলা সদস্য
১২		মোসাঃ আছমা খাতুন	মহিলা সদস্য
১৩		মোসাঃ শাহিদা বেগম	মহিলা সদস্য

উৎসঃ মাঠ জরিপ

চিত্রঃ ১.১ঃ বাংলাদেশের মানচিত্র (ঢাকা চিহ্নিত)।

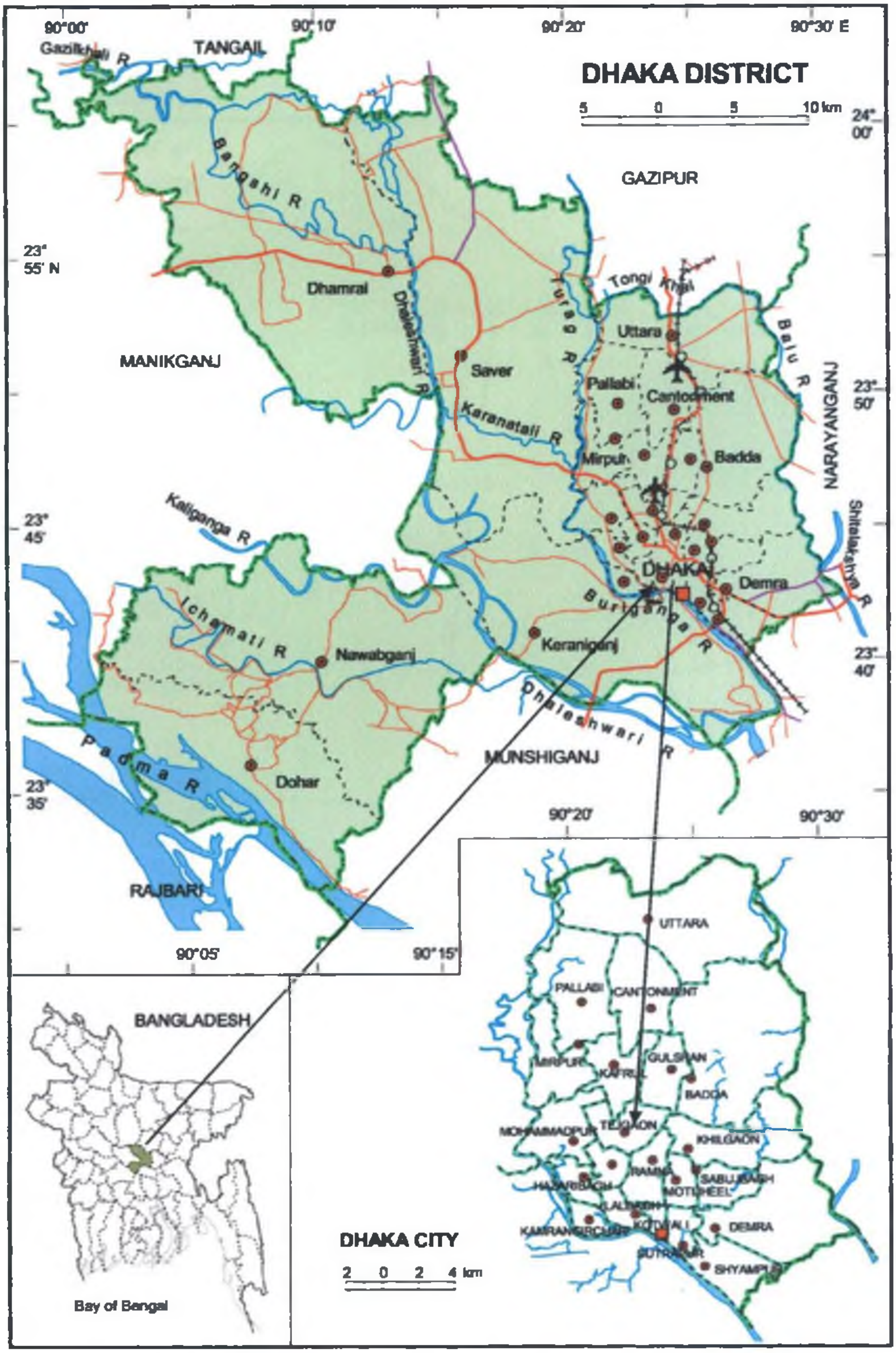

চিত্র ১.২ঃ ঢাকা জেলার মানচিত্র (তেজগাঁও সার্কেল চিহ্নিত)।

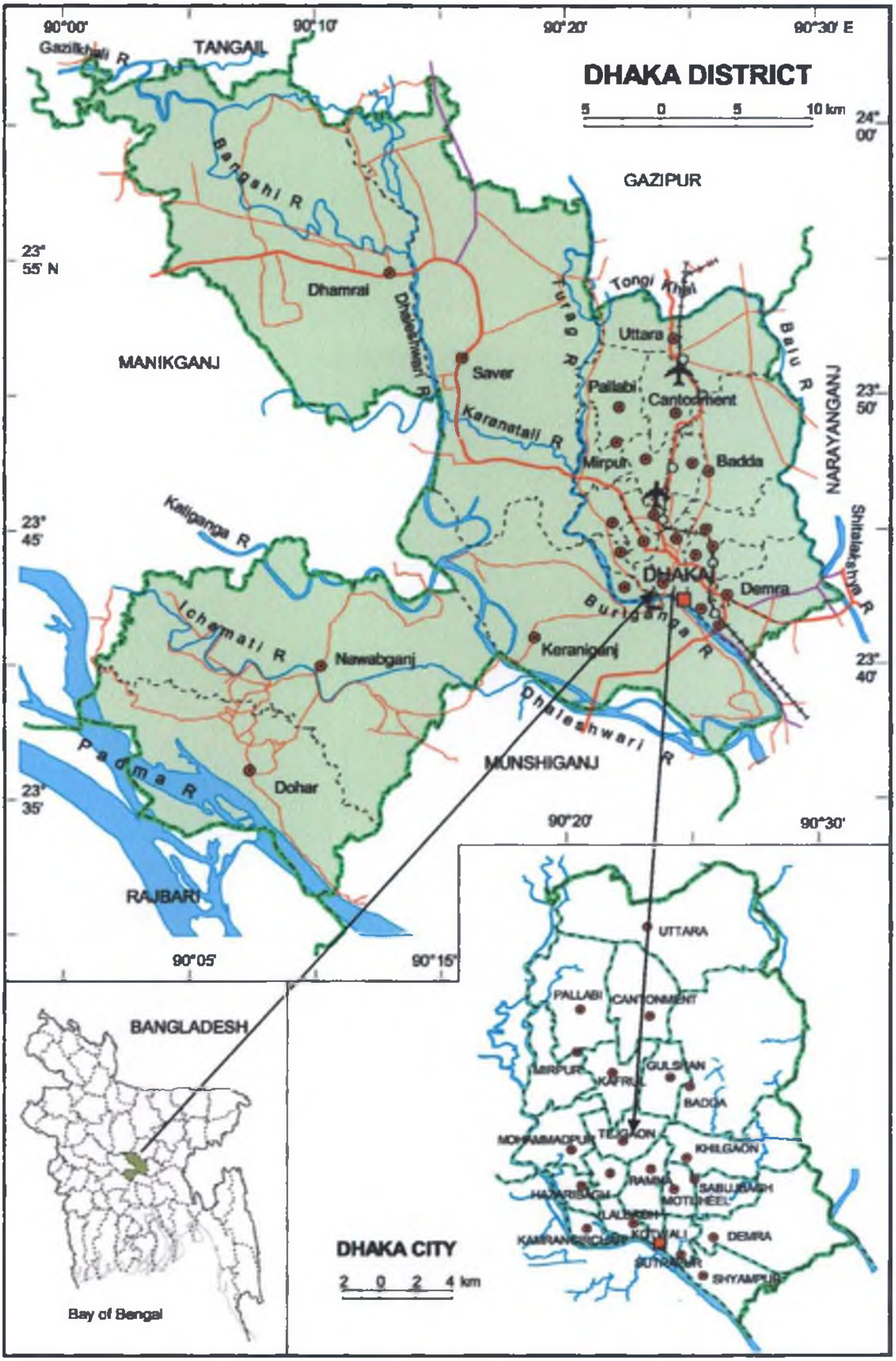

চিত্র ১.২ঃ ঢাকা জেলার মানচিত্র (তেজগাও সার্কেল চিহ্নিত)।

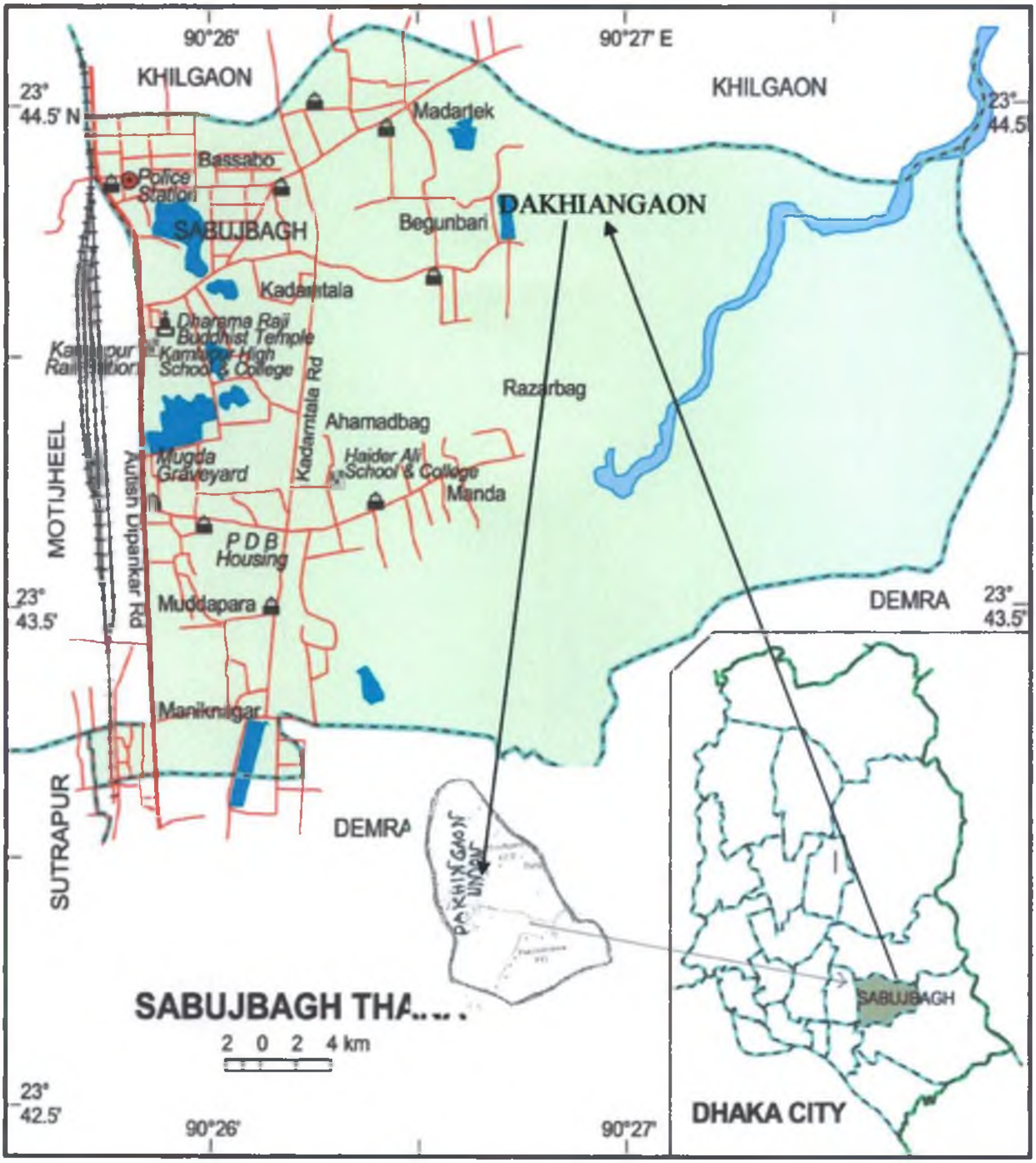

চিত্র ১.৩ঃ সবুজ থানার মানচিত্র (দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন চিহ্নিত)।

চিত্র ১.৪ঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মানচিত্র।

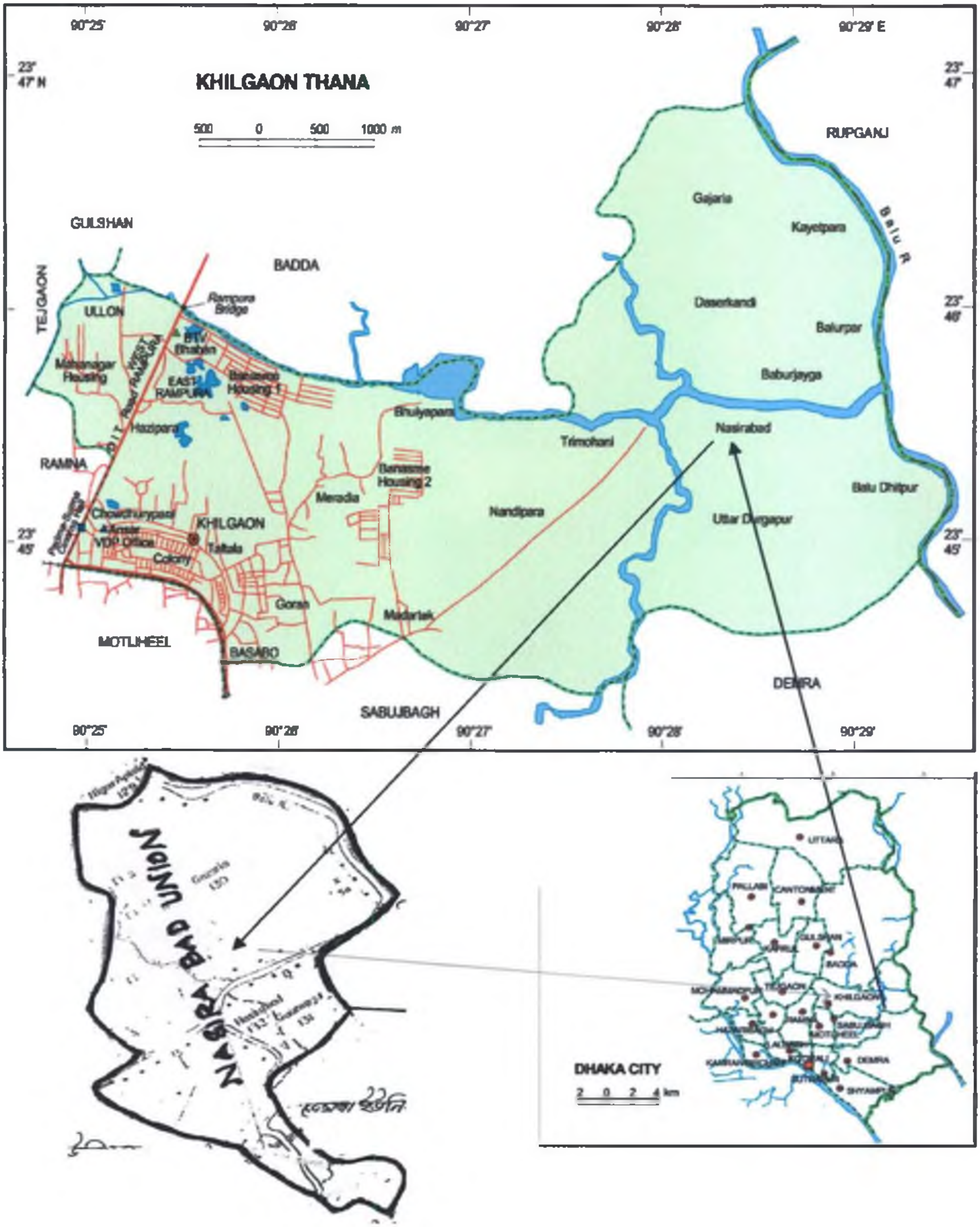

চিত্র ১.৫ঃ খিলগাঁও থানার মানচিত্র (নাসিরাবাদ ইউনিয়ন চিহ্নিত)।

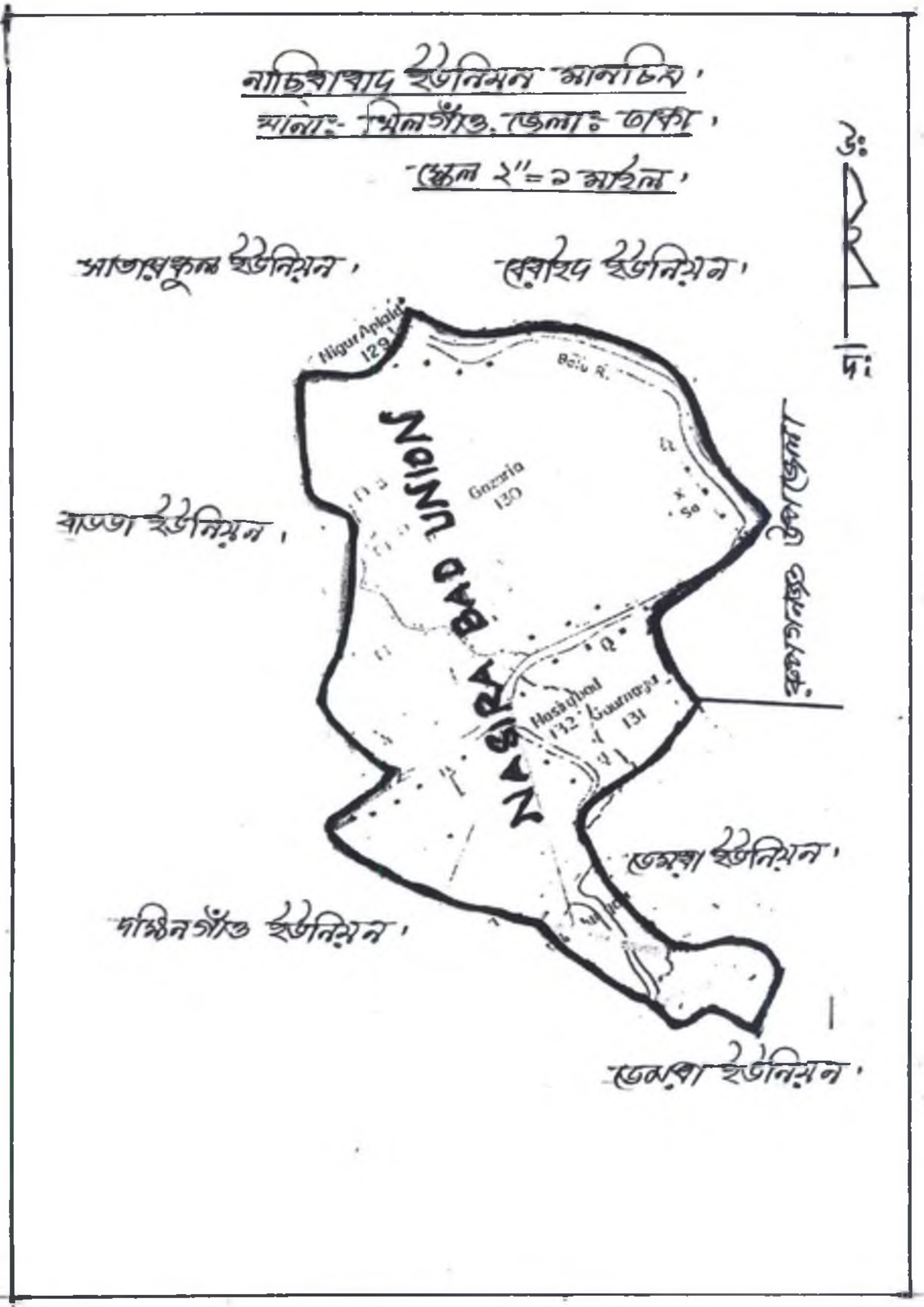

চিত্র ১.৬৪ নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মানচিত্র।

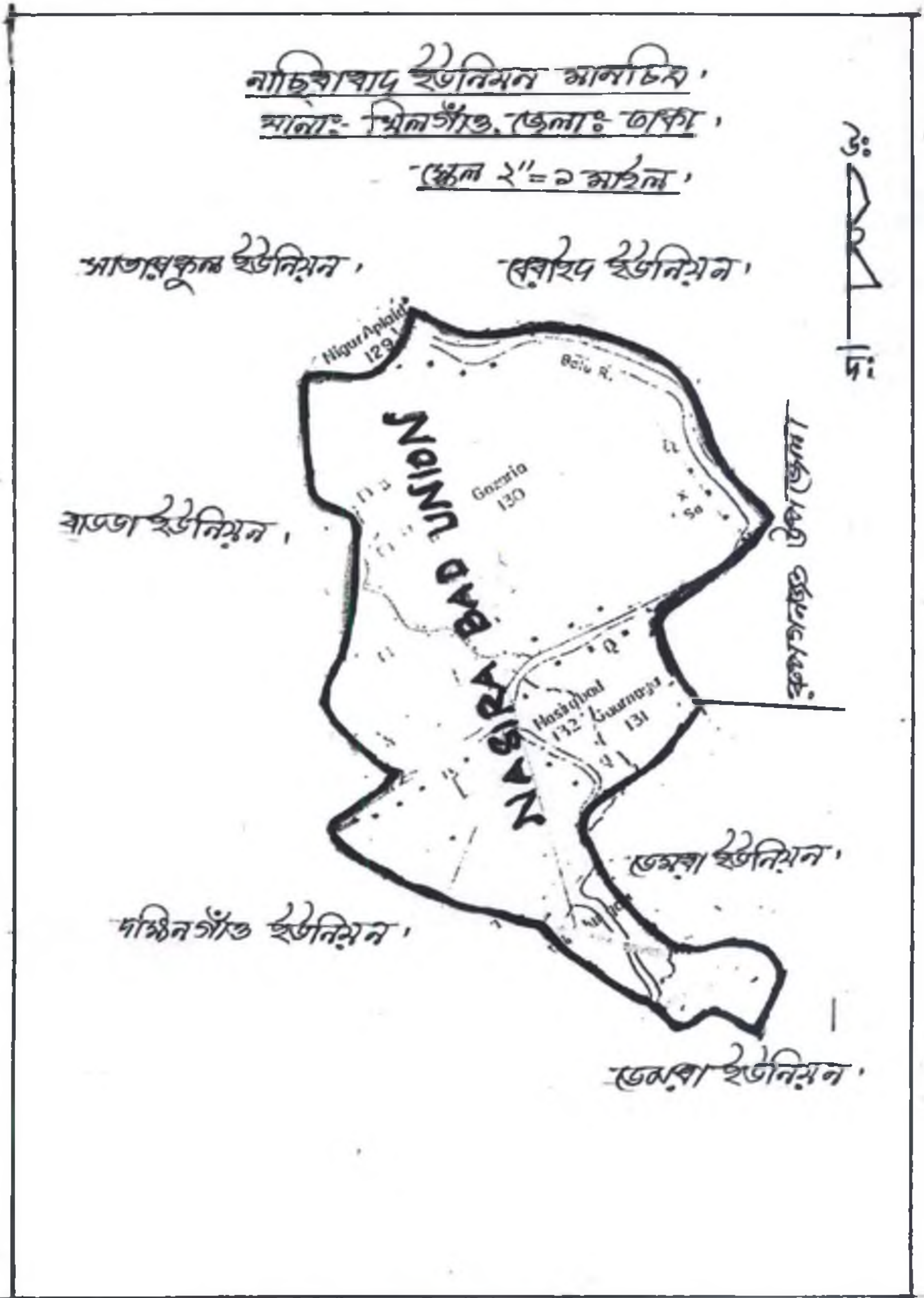

চিত্র ১.৬ঃ নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মানচিত্র।

গবেষণার পদ্ধতি ঃ ইংরেজী Research শব্দ থেকে বাংলায় "গবেষণা" শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পুনরায় অনুসন্ধান করা। সাধারণতঃ সুশৃঙ্খল অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে বোধগম্য ও যাচাই যোগ্য জ্ঞান সংযোজন প্রক্রিয়াই হলো গবেষণা।

Marry E Macdonald (Polansky, 1960:24) বলেছেন Research may be defined as systematic investigation intended to add to available knowledge in a form that is communicable and varifiable.

অন্যদিকে পদ্ধতি বলতে এক ধরনের দার্শনিক মূল্যায়নকে বুঝানো হয় যা কোন বিষয়ে অনুসন্ধানের কৌশলকে বুঝায়।

যে কোন বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত পদ্ধতির ওপর। সমাজ বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের মত সঠিকতা দান এবং বিশ্লেষণ করে থাকে। তাই সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় এক বা একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। তবে এক্ষেত্রে গবেষক তার গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালা তৈরি করে দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও জনগণের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। অন্যদিকে গবেষণাকে অর্থবহ করে তোলার জন্য কেসষ্টাডি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি। এর মাধ্যমে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয় তা সাধারণতঃ সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তাছাড়া এতে সরাসরি উত্তর দাতা গবেষক বা তথ্য সংগ্রহকারীকে দেখার সুযোগ ও ভাব বিনিময়ের সুযোগ ঘটে।

Lindzey বলেন If you want to know how people feel, what they experience and what they remember, what their emotion and motives are like and the reason for acting as they do-why not ask them? (Lindzey, 1975:528) সুতরাং সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করাই আমার জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি।

কেস স্টাডি হলো এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি এককের অনুসন্ধানকারী যার সম্পর্কে অভিপ্রায় পোষণ করেন ও পদ্ধতি গ্রহণ করেন ক্ষুদ্র, সর্বাত্মক ও গভীর অনুধ্যান।

বার্কারের মতে, A method of evaluation by examining systematically many characteristics of one individual, group, family or community, usually over an extended period (Barker, 1994:30)

কেস স্টাডি পদ্ধতির বড় সুবিধা হলো এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল, সমষ্টি, প্রতিষ্ঠান, ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে সুগভীর ও সুবিস্তৃত ধারনা লাভ করা যায়। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সমস্যার প্রকৃত, প্রভাব, গভীরতা এবং এর উন্মেষ ও বিকাশ সম্পর্কিত ধারনা লাভ করা যায়।

H. Odum কেস স্টাডি সম্পর্কে বলেন The case study method is a teachnique by which individual factor whether it be an institution or just an episode in the life of an individual or a group is analysed in its relationship to any other in the gorup. সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সমস্যাকে কেস স্টাডির মাধ্যমে তুলে ধরে গবেষণার ফল আরো বেশী সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

নমুনার আকার ঃ গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য চার ধরনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমতঃ দুইটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, দ্বিতীয়তঃ দুইটি ইউনিয়ন পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্য, তৃতীয়তঃ দুইটি ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনের

মহিলা সদস্য, চতুর্থতঃ দুইটি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে থেকে ৯০ জন সাধারণ গ্রামবাসী নমুনা উত্তরদাতা হিসাবে বাছাই করা হয়। মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারী সাধারণ গ্রামবাসীদের দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতিঃ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য চারটি আলাদা প্রশ্নমালা তৈরী করে তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নগুলো গবেষণার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিন্যাস করার পর তা প্রাথমিক ভাবে পরীক্ষা করা হয়।

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণঃ আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্য প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত সমূহ সঠিকভাবে সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের জন্য মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্য সাবধানের সাথে অন্তর্ভূক্তির পর তার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সারণী তৈরী করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্থানীয় সরকারের ধারণা

স্থানীয় শাসনের ধারণা দুইটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রথমতঃ জনগণ নিজেদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলবে; এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন মিটাতে হলে প্রত্যেক স্থানীয় সম্প্রদায়কে আত্মশাসনের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। মূলতঃ স্থানীয় পর্যায়ে যে সব সমস্যা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধান বের করাই স্থানীয় শাসনের মূল লক্ষ্য।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলির আয়তন ও জনসংখ্যা বেশী হওয়াতে জাতীয় সরকারের কার্যকলাপে সকল নাগরিক অংশগ্রহণের সুযোগ পায় না। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া স্থানীয় শাসন পরিচালনার ফলে নাগরিকগণ যে প্রশাসনিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে। টকভিল বলেন, "... a nation may establish a system of free Government, but without the spirit of municipal institutions it can not have the spirit liberty." (Tocqueville, 1945: 605). স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন নাগরিক দিগকে তাঁহাদের সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করে, তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করে। আত্ম প্রত্যয় ও আত্মনির্ভরশীলতার মনোভাব জাগরিত করে, স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং উহাকে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয় (হক, ১৯৭৪ঃ৩১৩)। লর্ড ব্রাইস যথার্থই বলেছেন যে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন গণতন্ত্রের সর্বোত্তম শিক্ষাকেন্দ্র এবং উহার অনুশীলন গণতন্ত্রের সাফল্যের সর্বাপেক্ষা বড় গ্যারান্টি। (... the best school of democracy, and the best guarantee for its success, is the practice of local self government (Bryce,1922:13-132). আধুনিক সরকারের কার্যাবলী জটিল হওয়াতে কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে সমস্ত কাজ করা সম্ভব নয়। কাজেই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে স্থানীয় জনগণই ভাল জ্ঞান রাখেন। স্থানীয় বিষয়াবলীর শাসন ভার স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হলে তারা স্থানীয় চাহিদা ও সমস্যাবলী সঠিকভাবে নির্ধারিত করতে সক্ষম হবে।

কেন তৃণমূল পর্যায়ে ইউপি স্তর

ইউনিয়ন পরিষদ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। গ্রাম এলাকার জনসাধারণের কল্যান ও দায়িত্বশীল সরকারের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ স্তর করা হয়েছে। এই পরিষদ ব্যবস্থার সাথে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। এটি আমাদের দেশের একমাত্র স্থানীয় প্রশাসন যেখানে সকল স্তরের সকল নাগরিকের অধিকার যাচাই বাছাই হয়ে থাকে। এই পরিষদটি জনগণের সবচেয়ে নিকটতম নির্বাচিত প্রশাসনিক কাঠামো।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য মানুষের কাছাকাছি গিয়ে দেশ ও সমাজের উন্নয়নের জন্য ভালো উদ্যোগের প্রয়োজন রয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ের তথা গ্রামের সাধারণ পেশার মানুষগুলো দেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখে বলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হয়। তাই গ্রামের সাধারণ মানুষদের সঠিক ভাবে কাজ লাগাতে পারলেই দেশ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। নতুবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামের উন্নয়ন, যাতে করে গ্রামের জন সাধারণ তথা দেশের ৯০ ভাগ লোকের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নকরা যায়। (হক, ১৯৮২ঃ ৫২)। গ্রাম স্বায়ত্ত্বশাসনের সর্বনিম্ন একক ইউনিয়ন পরিষদ। পরিষদই একমাত্র ইউনিট যা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের দাবী রাখে (Mahtab,1978:16)। কারণ চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। থানা এবং জেলার প্রতি নজর দিলে আমরা দেখি সেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরণের কোন ব্যবস্থা নেই। ইউনিয়ন পরিষদ সর্বত্র গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের একক এবং গ্রামের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আমাদের গ্রাম স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলোর মূল উদ্দেশ্য গ্রামের জনসাধারনের উণ্নয়নে গ্রাম এলাকার উন্নতি করা। গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেজন্য গ্রামের উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা রয়েছে। যে সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউনিয়ন পরিষদ স্তর করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১। ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণ সরাসরি গ্রামের উন্নয়নমূলক কর্মে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পারবে। ফলে স্থানীয় শ্রম ও সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে। গ্রামের মানুষ নিজেদের এলাকায় কাজ করার সুযোগ পেলে স্থানীয় ভাবে তাদের বেকারত্বের অবসান ঘটবে। তাছাড়া পরিচিত পরিবেশে কাজ করার সুযোগ পেলে একদিকে যেমন জনসাধারণ দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ হবেন, অন্যদিকে তেমনি সকলের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে গ্রামীন সমস্যার সমাধান হবে।

২। ইউনিয়নের জনগণকে সংগঠিত হতে উৎসাহ প্রদান, বন্যা, খরা, নদী ভাঙনের মতো নানা দুর্যোগের সামাজিক শক্তির বিকাশে ইউনিয়ন পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। কারণ স্থানীয় সমস্যা স্থানীয়ভাবে যত সহজে মেটানো সম্ভব অন্যভাবে ততো সহজ নয়।

৩। ইউনিয়ন পরিষদ স্তর সৃষ্টির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের চাপের পরিমাণ হ্রাস পায়। কম গুরুত্বপূণ বিষয়গুলি স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে।

৪। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে শাসন কাজে অংশগ্রহণ করার ফলে জনগণের মধ্যে সচেতনতার উন্মেষ ঘটে। জনসাধারণ স্থানীয় পরিস্থিতি ও সমস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। ফলে তাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয় যা সুনাগরিকতার সূচনা করবে।

৫। স্থানীয় শাসনকাজে অংশগ্রহন ও শাসন ক্ষমতা উপভোগ করার ফলে জনসাধারণের মধ্যে দায়িত্বশীল নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে। শাসন ক্ষমতায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তারা অধিকতর দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে।

৬। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ স্থানীয় শাসন কাজে অংশগ্রহন করতে পারবেন। ফলে শাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে এবং স্থানীয় সমস্যার ক্ষেত্রে সাধারণত স্বল্প ব্যয়ে ও অতি অল্প সময়ে সমাধান খুঁজে পেতে পারবে।

৭। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বৈরাচারী কার্যকলাপের সুযোগ কমে আসে। সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়;

৮। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে, বিভিন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে ও শাসনকাজে অংশগ্রহণ করার ফলে জনগণের রাজনৈতিক, চেতনা বৃদ্ধি পায়;

৯। গ্রামীন জনগণকে স্থানীয় বিষয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রদান;

১০। ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীন জনগণকে বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করা।

১১। জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস সংঘটিত করা।

১২। স্থানীয় অধিবাসীদের স্থানীয় প্রশাসনে অংশগ্রহণ ও উদ্যোগ সুনিশ্চিত করা;

১৩। কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ হ্রাস করা;

১৪। গ্রামের মানুষদের মধ্যে সরকারী কাজকর্মে অংশগ্রহণের মানসিকতা গড়ে তোলা;

১৫। গ্রামের জনগণ তাদের প্রতিনিধির কাজকর্ম যাতে পর্যালোচনা করতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা কাঠামো

ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা কাঠামো জানার আগে ক্ষমতা বলতে কি বুঝায় তা জানা প্রয়োজন। কারণ উন্নয়ন ও ক্ষমতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় যে শ্রেণীর হাতে সম্পদ বেশী থাকে তাদের হাতেই সমাজের যাবতীয় ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন, কর্তৃত্ব, প্রভাব, শক্তি এবং সহিংসতা ইত্যাদি।

পোলানতজা বলেছেন, ... the concept of power is related to that precise type of social relation which is a field inside which, precisely because of the existence of classes, the capacity of one class to realize its own interests through its practice is in opposition to the capacity and interests of other classes. This determines a specific relation of domination and subordination of class practices, which is exactly characterized as a relation of power (polantzas, 1986:45).

লাসওয়েল মনে করেন, মানুষ তখনই ক্ষমতাবান হয় যখন সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অর্জণ করেন (Laswell, 1950:40)। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও এই সংজ্ঞায় কাঠামোগত প্রশ্ন তোলা হয়না। আপাতঃ দৃষ্টিতে যিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন আসলে তিনি একটি কাঠামোর অন্তর্নির্হিত শক্তির প্রতিনিধি। সেই ভেতরের দ্বান্দিক অবস্থান এই সংজ্ঞায় ফুটে ওঠেনা। (রহমান, ১৯৮৮:৪৫)। আর, এইচ টোনি বলেন, Power is the capacits of an individual or group of individuals, to modify the conduct of other individuals or group in the manner which he desires. (Tawney, 1952:230). অর্থাৎ ক্ষমতা হচ্ছে একান্তই অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্যের একটি পরিসীমা, যার মাধ্যমে ক্ষমতাবান ব্যক্তি তার ইচ্ছানুসারে যে কোন কর্ম সম্পাদনে সক্ষম।

ওয়েভার বলেন, Power is the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carryout his own will despite

resistance, regardless of the basis on which this probability rests. (Weber, 1960:152). তার মতে, কোন ব্যক্তি বা গ্রুপের বাধা পাওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার নিজের স্বার্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হন তাহলে বুঝতে হবে ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ক্ষমতাবান।

ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়েভারের সংজ্ঞায় সমাজের নায়কদের 'আদেশ' প্রদান ও বাস্তবায়নের ওপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। একটি কর্তৃত্ববাদী সংগঠনের কারো নির্দেশ মান্য করার এই ব্যাপারটি আসলে বৈধতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এতে শ্রেণী হিসেবে সমাজের অধিবাসীদের দেয়া হয়নি (আতিউর, ১৯৮৮ঃ৪৬)।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। ক্ষমতা হচ্ছে প্রতিরোধ সত্ত্বেও একজন ব্যক্তির ইচ্ছা বাস্তবায়নের সামর্থ্য কিংবা দক্ষতা এখানে রয়েছে কর্তৃত্বের অধিকারী ও কর্তৃত্ব মেনে চলতে অনুগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার সম্পর্ক এবং নীতি নির্ধারন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রশ্ন।

ক্ষমতার কাঠামোঃ কাঠামো বলতে বুঝায় যে সব লোক যাঁরা সমষ্টির বিভিন্ন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যদেরকে প্রভাবিত করেন। তাঁদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নেতাও বলা হয়। সমষ্টি উন্নয়ন কর্মীগণ একথা স্বীকার করেন যে, সমষ্টির কোনো কোনো লোক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্য লোক থেকে বেশি প্রভাবশালী। তারা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্য লোককে প্রভাবিত করেন। (রহমান, ১৯৯৯:৬৩-৬৪)। জন মিচেলের মতে সমষ্টির বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি বিভিন্নভাবে সাধারণ জন সমষ্টিকে প্রভাবিত করেন। তিনি পিরামিডের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রমান করতে চেয়েছেন।

রেখাচিত্র ২.১ঃ ক্ষমতার পিরামিড

উৎসঃ Ross, Murry G. & Hendry, Charles E. New Understanding of Leadership. Association Press. New York. 1966.

ক্ষমতার কাঠামো সঙ্গে পরিচিত

মর্যাদা পরিমাপ পদ্ধতি ঃ সমষ্টিতে যে সব বিধিবদ্ধ ও অ-বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর সঙ্গে যাঁরা জড়িত বিশেষ করে যাঁরা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তাদেরকে ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন স্কুলের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, পঞ্চায়েতের মাতব্বর প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গঃ সমষ্টির উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলীতে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং সমষ্টির সমস্যাবলীর ব্যাপারে যাঁরা জোরালো বক্তব্য রাখেন তাঁরা সাধারণত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সম্রান্ত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গঃ অর্থনৈতিক অবস্থা যাঁদের স্বচ্ছল তাঁরাও লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। কেননা তাঁরা জনগণকে প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে থাকেন। সরকারি অফিস-আদালতের সঙ্গে যারা জড়িত এবং সমাজের যাঁরা উচ্চ শিক্ষিত বা কোনো বিশেষ এলাকায় যারা সর্বোচ্চ শিক্ষিত বলে পরিচিত তাঁরাও সাধারণ লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকেন।

স্থানীয় নেতৃত্বঃ সুপারিশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সঠিক ও সফল বাস্তবায়ন অনেকাংশে সকল স্তরের কার্যকরী নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে। পুর্বে গ্রামঞ্চলে ক্ষমতা কাঠামো যে রকম ছিলো বর্তমানে তা ভিন্ন রূপ লাভ করেছে। আগে গ্রামের মানুষ তার সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর মুখোপেক্ষী হতো। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বিধিবদ্ধ সংস্থা গড়ে উঠার ফলে গ্রামের মাতব্বর ও সর্দারদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া আরও বিভিন্ন প্রকারের নেতৃবৃন্দ গ্রামের জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। যথা ধর্মীয় নেতা, মসজিদের ইমাম, মক্তব্যের শিক্ষক গ্রামীন জনসাধারণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। এ ছাড়া আরো এক ধরনের অর্ধশিক্ষিত লোক আছেন যারা স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। অফিসের নিয়মাবলী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে তারা সমাজে টাউট বলে পরিচিত (রহমান, ১৯৮৮:৪৫)। গ্রাম পর্যায়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। মাতব্বরগণ আগের ধাঁচের ক্ষমতাবান। এদের ক্ষমতা সাধারণত অর্থনৈতিক সম্পদ, শিক্ষা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার/চেয়ারম্যানগণ দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষমতাবান। গ্রামীন সমাজে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কারণে পুরোনো ধাঁচের ক্ষমতা ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটছে।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতির কারণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি খানিকটা বেড়েছে। গ্রাম সরকার চালু হওয়ায় তারা আরও কিছু বাড়তি ক্ষমতা পাবে। বাংলাদেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ হওয়ায় বর্তমানের সরকারগুলো কৃষিকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করছে। আর কৃষি ঋণ পেতে হলে কৃষকদের ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বের সাহায্য অবশ্যি নিতে হয়। কৃষকরা কৃষি ঋণের জন্য আবেদনের সময় নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট ইউনিয়ন পরিষদ অফিস হতে সংগ্রহ করে। এর জন্য পরিষদের সদস্যদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কৃষি ঋণ বিতরনের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি রয়েছে। এসব কমিটির নেতৃত্ব সাধারণতঃ চেয়ারম্যান ও সদস্যরা দিয়ে থাকেন। এরাই কৃষক ঋণ পাবার উপযুক্ত কিনা সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন। এচাড়াও কৃষি ব্যাংক বা অন্যান্য ব্যাংকের সাথে কৃষকদের যোগাযোগ করিয়ে দেবার দায়িত্ব ইউপি নেতৃত্ব নিয়ে থাকেন। সরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণ করা কারণে। আজকাল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যানদের ক্ষমতা বেশ কিছুটা বেড়েছে।

সাধারণ প্রশাসন যেমন পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী অফিসারদের সঙ্গেও ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃত্বের যোগাযোগ বেড়েছে। থানার ওসি গ্রাম পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি। তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারলে গ্রামীন ক্ষমতার কাঠামোতে জোরালো ভূমিকা পালন করে। পুলিশ ইচ্ছে করলে একজন অপরাধীকে নিরপরাধী এবং একজন নিরপরাধীকে অপরাধী বলতে পারে। অর্থ দিয়ে পুলিশকে প্রভাবিত করার কথা প্রমানের অপেক্ষা রাখেনা। আর সেই কারণেই ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃবৃন্দের সাথে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর বলা চলে (আতিউর, ১৯৮৮:৪৬)। শেকড় পর্যায়ে তহশীলদারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জমির খাজনা নেওয়া ছাড়াও, জমি জমার কাগজপত্র তৈরীর সময় এদের কাছে মানুষকে যেতে হয়। দেখা যায় যে স্থানীয় ক্ষমতাবানরা তহশীলদারদের যেমন খুশী করার চেষ্টা করেন। তহশীলদাররাও নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাবানদের মতামতের দাম দেন।

সব শেষে বলা যায় গ্রামীন প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্পর্ক বেশ ভালো। পারস্পারিক স্বার্থেই এ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন বলে প্রতীয়মান।

ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ

যদিও স্বশাসিত ও প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে সমান্তরাল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়া আমাদের অঙ্গীকার। তবুও বাস্তব অবস্থা এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সংবিধানে স্থানীয় সরকারের কথা বলা হলেও এর রূপরেখা কেমন হবে, কোন পর্যায়ে কার কতটুকু ক্ষমতা থাকবে, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন বিবরণ নেই। আর এসব কারণেই স্থানীয় সরকারকে অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করতে হয়। সংবিধানে স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের ধরণ ও ক্ষমতা আলাদা করে লিপিবদ্ধ থাকলে স্থানীয় সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব মুক্ত হয়ে কাজ করতে পারতো। আমাদের স্থানীয় সরকারগুলো মূলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি। কেন্দ্রীয় সরকার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে আইন সংশোধন করে, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এর একটি কার্যকর রূপ প্রদান করতে পারে।

বর্তমানে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো পরিচালিত হচ্ছে মূলত ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ (Loccal government ordinace, 1976-xc 1976), ১৯৭৬ সালের গ্রাম্য আদালত অধ্যাদেশ ও ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৯৩ সালের স্থানীয় সরকার এবং ১৯৯৩ সালের পৌরসভা সম্পর্কিত আইনের বলে তাছাড়াও রয়েছে ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এবং ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত আইনসমূহ। এ সব অধ্যাদেশ ও আনুসঙ্গিক বিধিবিধান সরকার প্রণয়ন করেন (আহমেদ, ১৯৮০:৪২০)। প্রয়োজন বোধে সরকার তাদের পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর কর্মক্ষেত্র, অধিকার ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারেন খর্বও করতে পারেন।

ইউনিয়ন পরিষদের ব্যাপারে জাতীয় সরকারের পর্যাপ্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে।

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল সমূহ ও বিশেষ তহবিলসমূহের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ।

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ।

(গ) কর, রেন্ট ও ফির পরিমান নির্ধারণ, আদায় এবং আনুসঙ্গিক সমস্ত বিষয়।

(ঘ) বাজেট প্রণয়ন ও মঞ্জুরী এবং আনুসঙ্গিক বিষয়।

(ঙ) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

(চ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচন এবং এ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

ইউনিয়ন পরিষদ বিকেন্দ্রীকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় তার অধিকাংশের মূলে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বাঁধা সৃষ্টিকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদকে নানা ধরনের অধ্যাদেশ আইন, আদেশ ও সার্কুলারের ভিত্তিতে তৈরী আইনগত কাঠামোর মধ্যে কার্যক্রম চালাতে হয়। এই কাঠামো অপ্রয়োজনীয়ভাবে ইউনিয়ন পরিষদকে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংগঠনরূপে পরিচালিত হওয়া থেকে বিরত রাখে। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ ব্যয়ের স্বাধীনতা পরিষদের নেই। সরকার নির্ধারিত কিছু নিয়মের মাধ্যমে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে বরাদ্দ করেন। ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারী নিয়োগ করার ক্ষমতা নেই। সকল কর্মচারী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেন।

প্রাশাসনিক নিয়ন্ত্রণ

আমাদের দেশের ইউনিয়ন পরিষদগুলো শুধু যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন তাই নয়, তা কেন্দ্রীয় সবকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এই নিয়ন্ত্রণ বহুমুখী।

১। জনগণের প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন উন্নয়ন সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদগুলো কোন কাজে হাত দিতে পারে না।

২। ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষমতা আছে এমন মনে হলেও আসলে ইউনিয়ন পরিষদকে এক্ষেত্রে নির্ভরশীল থাকতে হয় থানা নির্বাহী কর্মকর্তার ওপর। কেননা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর কেন্দ্রীয় বরাদ্দ থাকে থানা পর্যায়ে।

৩। নীতি নির্ধারক স্থানীয় সংসদ সদস্যগণকে প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষমতা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতাকে সংকুচিত করছে।

৪। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদের গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারেন। কোনো সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিতে পারে।

৫। সরকার যে সব দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের হাতে তুলে দিয়েছেন সেগুলোর ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তদারক ও তত্ত্বাবধান করতে পারে।

৬। নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে যে কোন ধরণের কাজ করার নির্দেশ দিতে পারেন। পরিষদ সে কাজ ঠিক মতো সম্পূর্ণ করতে না পারলে কর্তৃপক্ষ অন্য কাউকে দিয়ে তা করিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয় আদায় করতে পারে।

৭। উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তাবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। সাধারণতঃ জেলা প্রশাসন, সহকারী জেলা, স্থানীয় সরকার কর্মকর্তা, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউনিয়ন পরিষদের উপর কর্তৃত্ব করেন।

নারীর ক্ষমতায়ন

সারা বিশ্বে একবিংশ শতাব্দীতে যে বিষয়গুলো আলোচনার ঝড় তুলছে ক্ষমতায়ন এর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে নারীর যে মানবেতর অবস্থা কেবল তা থেকে মুক্তিই নয় সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীক যে কোন ধরনের সমস্যা সমাধান ও নীতি নির্ধারনে নারীর অংশগ্রহণকে অন্যতম অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ক্ষমতায়ন শব্দটি সর্ব প্রথম ব্রাজিলও শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরী (Paulo Fircire) নারীর সমঅধিকার প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধা বিপত্তি। প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়।

ক্ষমতায়ন বলতে বুঝায়, Good governance legitimacy and creativity for a flourishing private sector transformation of economics to self reliant, endogenous, human center development: promotion of community development through self help with an emphasis on the process rather than on the completion of particular projects; a process enabling collective decision making and collective action and popular participation, a concept that has gained popularity within the development agenda (sing & Tiji, 1995:13).

ক্ষমতায়ন হলো যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সব বিরাজিত কাঠামোগত অসমতা নিপীড়ন ও বঞ্চিতদের পশ্চাদপদ অবস্থায় রাখে তা থেকে উত্তরন। এই যৌথ প্রচেষ্টায় পুরুষও অংশীদার ক্ষমতার জন্য পুরুষের সঙ্গে নারীদের বৈষম্যেমূলক সংঘাতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। এই প্রচেষ্টা হলে নারীর শক্তি সঞ্চয় করার জন্য। পুরুষকে সহায়ক শক্তি হিসেবে গণ্য করা। ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত আলোচনার আদর্শিক ধারণা হলো পুরুষদের সঙ্গে সহাবস্থানে সমমর্যাদার নারীর অবস্থান প্রয়োজন, কেননা নারীও সমাজ ও রাষ্ট্রের নাগরিক। ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী সমাজে উপযুক্ত

পরিবেশ তৈরী করবে। কারণ জ্ঞান, আত্ম-সম্মান এবং আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহন ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হলো ক্ষমতায়ন।

ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট ও বিশেষ সংজ্ঞায়ন করেছেন Development Alternative with women for a new Era (DAWN) DAWN ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব উইমেন এর আগে কিছু নারী ব্যক্তিত্ব এবং নারী সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের নারী সমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা নয়, বরং একটি বিকল্প সমাজ ব্যবস্থা গঠনের চিন্তাশক্তি গঠন করা যায়। মূল উদ্দেশ্য এক পৃথিবী গঠন করা যেখানে প্রত্যেকটি দেশে এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার সম্পর্কে ক্ষেত্রে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সম্পর্ক এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্যে থাকবে না (ঠাকুরতা ও বেগম, ১৯৯৭ঃ১৮০)। এই পৃথিবী গঠনের দূর দৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী রূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা এসে পড়ে যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই নারী তার অধিকার আদায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারবে। বিশ্বব্যাপী নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিরজামান বৈষম্যের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটো বিষয় কাজ করছে। প্রথমতঃ নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা, দ্বিতীয়তঃ পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার। তাই নারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত আব্যশক। কেননা ক্ষমতায়ন ব্যতীত নারীর সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজনীতি ও ক্ষমতায়নের সঙ্গে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তাই রাজনীতিতে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সেই সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ে নারীকে অধিক হারে সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী ইস্যুকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে সক্ষম হবে যা উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

বাংলাদেশের নারী সমাজ সর্বত্রই তুলনামূলকভাবে অধস্তন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের প্রান্তিক অবস্থান। স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বিশেষভাবে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান এক্ষেত্রে ব্যাপক সংগঠিত বা সুসংহত নয় (আক্তার ১৯৯৫ঃ২৮)। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার। মানবিক, নাগরিক ও কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে নারী বৈষম্যের শিকার। যদিও নারী পুরুষ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকারসহ (ধারা ৩৬-৩৯) সকল মৌলিক অধিকার সংবিধান প্রদান করেছে। জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধান নারী পুরুষের কোনো পার্থক্য করেনি (৬৬-১২২)। সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে সংরক্ষিত আসনের বিধান করেছে (ধারা-৯)। সংবিধান জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে

নারীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহনের নীতি বিবৃত করেছে (ধারা-৯)। মৌলিক অধিকার হিসেবে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকার প্রদান করেছে তথাপি নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান প্রান্তিকে রয়ে গেছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারীর প্রতি বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত সনদের (১৯৭৯) দ্বিতীয় খন্ডে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় সরকার রাজনৈতিক ও জনজীবনে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে নারী পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার যেমন,

(ক) নারীদের সকল প্রকার নির্বাচনে ভোট প্রদান ও নির্বাচনের অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকবে।

(খ) রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ এবং সকল স্তরের সরকারী অফিসে কাজ করার সুযোগ থাকবে।

(গ) দেশের জনজীবন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বেসরকারী সংস্থা ও সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অধিকার নিশ্চিত করবেন।

আমাদের সংবিধান এবং জাতিসংঘ সনদে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে চিত্র একেবারে ভিন্ন। সমাজের গভীরে প্রথিত জেন্ডার বৈষম্য নারীকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সকল কর্মকান্ডে পুরুষের প্রাধান্য বিস্তারে সাহায্য করছে। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এখনও নারীকে পুরুষের মুখাপেক্ষী থাকতে হয়।

বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহনের প্রথম স্তর হলো গ্রাম তথা ইউনিয়ন। স্থানীয় সরকার স্থানীয় চাহিদা পুরনে একটি গুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠান যা জাতীয় সরকারের সৃষ্টি, সেজন্য জাতীয় পর্যায়ের মতো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে মহিলাদের স্থানীয় পর্যায়ে সম্পৃক্ততা বা প্রতিনিধিত্ব থাকা খুবই প্রয়োজন। কারণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোই রাজনীতিতে প্রবেশ করার প্রথম দ্বার সেখানে তারা প্রত্যক্ষভাবে জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারে। বৃটিশ আমল থেকে এ পর্যন্ত সরকারের বেলায় দেখা গেছে যে, সে প্রতিষ্ঠান গুলোতে পুরুষের আধিপত্য বিদ্যমান।

১৮৭০ সালের চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৫ বছর পরেও স্থানীয় সরকারের উচ্চ পদগুলি প্রধানত পুরুষদেরই কর্তৃত্বাধীন। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত মহিলাদের ভোটাধিকার ছিল না (কাদির ১৯৯৪:১। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিগত বছরে ৭টি স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা হচ্ছে যথাক্রমে ১৯৭৩,

১৯৭৭, ১৯৮৩, ১৯৮৮, ১৯৯২, ১৯৯৭ এবং ২০০৩ সাল। ১৯৫৬-৬৯ সাল মেয়াদে ২টি স্থানীয় সরকার সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু এ দুইটি নির্বাচনে কোনো মহিলা নির্বাচিত হননি। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ৪,৩৫২ টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে একজন মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে ৪,৩৫২ টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ৪ জন মহিলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৮৪ সালে ৪,৪০০ টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে মাত্র ৪ জন মহিলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং আরো দুইজন উপনির্বাচনে নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে ৪,৪০১ টি ইউনিয়ন পরিষদে চেয়ারম্যান প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৮৫৬৬ জন এবং মেম্বার প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১১৪৬৯৯ জন। এর মধ্যে মহিলা চেয়ারম্যান ছিলেন ৭৯ জন এবং মেম্বার প্রার্থী ছিলেন ৮৬৩ জন। এর মধ্যে একজন মহিলা চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে কেবলমাত্র ৩,৮৯৯টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে ১১৬ জন নারী চেয়ারম্যান পদে অংশগ্রহণ করে ১৯ জন বিজয়ী হয়। ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মত সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচন হয়েছে, সংরক্ষিত আসনে ৪৪১৩৪ জন নারী অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ১২৮২৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। এই নির্বাচনে ৪২৭১ জন চেয়ারম্যান প্রার্থীর মধ্যে নারী ছিলেন ১০৩ জন তার মধ্যে জয়ী হয়েছেন ২২ জন নারী। সাধারণ সদস্য পদে নারী প্রার্থী ছিলেন ৪৫৬ জন এবং জয়ী হয়েছেন ১১০ জন। আর ২০০৩ এ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মোট সাধারণ মেম্বার পদে ৬১৭ জন নারী অংশগ্রহণ করেন এবং বিজয়ী হয় ৮৫ জন। চেয়ারম্যান পদে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা ২৩২ জন এবং ২২ জন বিজয়ী হয়।

সারণী ২.১ঃ ১৯৭৩-২০০৩ পর্যন্ত ইউপিতে নির্বাচিত মহিলা চেয়ারম্যানদের অবস্থান

নির্বাচনের সন	ইউনিয়নের নাম	নারী প্রার্থী	নির্বাচিত নারী চেয়ারম্যান	নারী চেয়ারম্যান শকতরা হার
১৯৭৩	৪৩৫২	-	১	০.০২
১৯৭৭	৪৩৫২	-	৪	০.০৯
১৯৮৪	৪৪০০	-	৬	০.১৪
১৯৮৮	৪৪০১	৭৯	১	০.০২
১৯৯২	৪০৫০	১১৬	১৯	০.০৭
১৯৯৭	৪৪৬১	১০৩	২২	০.৪৯
২০০৩	৪২২৩	২৩২	২২	৫.৪৩

উৎসঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (জনসংযোগ শাখা) ২০০৪।

উপরের সারণী হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন হতে দেখা যায় ১৯৭৩ সাল হতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত ৭টি নির্বাচনে নারী চেয়াম্যানের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। তবে এ বৃদ্ধির হার খুবই কম। কম হলেও পুরুষ চেয়াম্যানদের সাথে সরাসরি প্রতিযোগীতা করে জয়ী হওয়াকে মহিলাদের

যোগ্যতাই প্রমাণ করে। বিগত নির্বাচনের ফলাফলের ধারাবাহিকতা অনুসারে বলা যায় নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ ও মহিলাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রদান করা হলে মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে।

ইউনিয়ন পরিষদের উপরের স্তরের উপজেলা পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। এতে ৮ জন মহিলা উপজেলা চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কেউ নির্বাচিত হয়নি (মাসদিত, ১৯৯৭ঃ৩৪)। পরবর্তীতে অধ্যাদেশ দ্বারা উপজেলা পরিষদ বাতিল করাতে মহিলারা এই নির্বাচনে আর অংশগ্রহণ করতে পারেনি। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান, ৯জন নির্বাচিত সদস্য ও ৩জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী সদস্য নিয়ে গঠিত। জেলা পরিষদ ও পৌরসভায় নারীদের জন্যে তিনটি করে সংরক্ষিত আসন আছে। সিটি কর্পোরেশনে নারী সংরক্ষিত আসনগুলো জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে করা হয়। পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে এ পর্যন্ত কোন নারী নির্বাচিত হননি। অন্যদিকে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে কোন নারী মেয়র হিসাবে অংশগ্রহণ করেননি। তবে ২০০২ সালে সরাসরি আসনে ৬ জন মহিলা কমিশনার নির্বাচিত হন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ৩০০টি আসন সম্বলিত এককক্ষ বিশিষ্ট্য আইন সভা। এই আসনগুলো সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তি সাপেক্ষে একক নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত। নারী পুরুষ উভয়ের জন্য এই আসনগুলো উন্মুক্ত এবং এই আসনের জন্য প্রার্থীতার যোগ্যতার মাপকাঠিতে নারী পুরুষে কোনো পার্থক্য সংবিধান করেনি। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতায় এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। এই আসনগুলোতে পুরুষের প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য বিরাজমান। নারী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থেকে অনেক দূরে। এর কারণও অনেক, রাজনীতিতে প্রবেশ যোগ্যতার সহায়ক শিক্ষা, পেশা, কর্মক্ষেত্রের প্রান্তিক অবস্থান, সামাজিক প্রক্রিয়া, সামাজিকভাবে আরোপিত নারী চরিত্রের 'গুণাবলী' এবং সামাজিক পারিবারিক ভূমিকা ও দায়দায়িত্ব নারীকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশে অনুপ্রানিত করে না বা টিকে থাকতে সহায়ক হয় না।

স্বাধীনতার পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন গুলিতে দেখা যায় সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার খুবই কম। সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহনকারী প্রার্থীদের মধ্যে মহিলাদের প্রার্থীতা ছিল ১৯৭৩ সালে শতকরা ০.৩, ১৯৭৯ সালে ০.৯, ১৯৮৬ সালে ১.৩, ১৯৮৮ সালে ০.৭, ১৯৯১ সালে ১.৫ এবং ১৯৯৬ সালে ১.৩৬ ও ২০০৩ সালে ২% ভাগ।

সারণী ২.২ ঃ আইন সভায় সরাসরি নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহনের চিত্র

বছর	নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সরাসরি নির্বাচনে বিজয়ী নারীর সংখ্যা	উপনির্বাচনে বিজয়ী নারীর সংখ্যা
১৯৭৩	০.৩	০	০
১৯৭৯	০.৯	০	২
১৯৮৬	১.৩	৫	১
১৯৮৮	০.৭	৪	০
১৯৯১	১.৫	৮	১
১৯৯৬	১.৩৬	৫	২
২০০১	২	৬	০

সূত্রঃ নির্বাচন কমিশন।

তবে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। কিন্তু ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর এই হার তেমন বৃদ্ধি পায়নি। ২০০১ সালের ৩০০ সাধারণ আসনের মধ্যে ৬ জন মহিলার সরাসরি বিজয়ী হওয়া এদেশের মহিলাদের সক্রিয় রাজনীতিতে মারাত্মক সীমবদ্ধতাই তুলে ধরে।

এছাড়া জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ১৫ টি। ১৯৭৯ সালে এ সংখ্যা ৩০টি উন্নীত করা হয়। এ আসনগুলোর সদস্যগণ নির্বাচিত হচ্ছে জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনয়নের মাধ্যমে। ফলে সংরক্ষিত আসন গুলোতে কখনই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে ২০০৩ সালে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪৫ করা হয়েছে। নিম্নে সংরক্ষিত আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা দেখানো হলঃ

সারণী ২.৩ ঃ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিত্ব

নির্বাচনের সন	আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দলের প্রার্থী
১৯৭৩	১৫	আওয়ামী লীগ
১৯৭৯	৩০	বিএনপি
১৯৮৬	৩০	জাতীয় পার্টি
১৯৮৮	-	-
১৯৯১	৩০	বিএনপি+জামায়েত ইসলামি (২৮+২)
১৯৯৬	৩০	আওয়ামী লীগ + জাতীয় পার্টি (২৭+৩)

সূত্রঃ দৈনিক বাংলা বাজার, ২৫ জুন, ১৯৯৭।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় মহিলাদের অংশগ্রহনের হার অত্যন্ত কম। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হলেও তাদের অবস্থান সুবিধাজনক নয়। বাংলাদেশে মহিলা মন্ত্রীসভায় অবস্থানের

ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশেষ দিক হচ্ছে মহিলাদের কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া তাদের পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব না দিয়ে প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী দায়িত্বে নিয়োগ প্রদান করে। মন্ত্রণালয়ের বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের সাধারণতঃ সমাজকল্যাণ, মহিলা, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য, ইত্যাদি ক্ষেত্রে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এছাড়া দেশ স্বাধীনের পর নারী মন্ত্রীদের হার পুরুষ মন্ত্রীদের তুলনায় অনেক কম ছিলো। যা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করেছে। ১৯৭২ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত মহিলা মন্ত্রীদের হার নিম্নরূপ।

সারণী ২.৪ ঃনারী মন্ত্রীদের অংশগ্রহণের হার।

সময়কাল	মোটমন্ত্রী	নারী মন্ত্রী	শতকরা
আওয়ামীলীগ সরকার (১৯৭২-৭৫)	৫০	০২	০৪
বিএনপি সরকার (১৯৭৯-১৯৮২)	১০১	০৬	০৬
জাতীয় পার্টি সরকার (১৯৮২-১৯৯০)	১৩৩	০৪	০৩
বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬)	৩৯	০৩	০৫
আওয়ামীলীগ সরকার	২৪	০৪	১৬
বিএনপি সরকার	৬০	০৩	০৫

উৎসঃ আবেদা সুলতানা নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তিঃ একটি বিশ্লেষণ ক্ষমতায়ন সংখ্যা ২,১৯৯৮, উইমেন ফর উইমেন।

মহিলাদের চাকুরী ক্ষেত্রে দেখা যায় গেজেটেড বা এর সমমর্যাদার পদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১০ ভাগ এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে প্রবেশ পর্যায়ে শতকরা ১৫ ভাগ কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ নারীর জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ নারী। পুলিশ বিভাগে নারীদের অন্যান্য পদে নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকায় বিগত কয়েক বছর ঐ পদে নিয়োগ বন্ধ ছিল। এছাড়া পুলিশ বিভাগে অন্যান্য পদেও নারী সংখ্যা কম। সেনাবাহিনীতে নারীর নিয়োগ একেবারেই সীমিত। প্রফেশনাল ও টেকনিক্যাল পেশায় নারীর শতকরা অনুপাত ২৩%।

নারীর ক্ষমাতয়নে প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নে কিছু বাধা রয়েছে। সেগুলো হলো নিম্নরূপঃ

ক) **সামাজিক মূল্যবোধঃ** সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ নারীকে পুরুষের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। শিশুকাল হতে যে ধারণা নিয়ে নারী বড় হয় পরবর্তীতে তা তার জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পিতৃতন্ত্রের পক্ষে এমন সব মূল্যবোধ তৈরী হয় যা নারীকে ছুড়ে

ফেলে দেয় অন্ধকার আবর্তে। ফলে নারী প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হতে হয়।

খ) **অর্থনৈতিক কারণঃ** আমাদের দেশে নারীরা এখনও অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেনি। তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বদাই তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল। অর্থ উপার্জনে ক্ষেত্রে নারীরা সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পায় না। এছাড়া সামাজিক ও ধর্মীয় বাঁধা, অসুস্থ্যতা, সাংসারিক দায়িত্ব ইত্যাদি অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে।

রেখা চিত্র ২.২ঃ মহিলাদের অর্থ উপার্জনে বাধার কারণ সমূহ

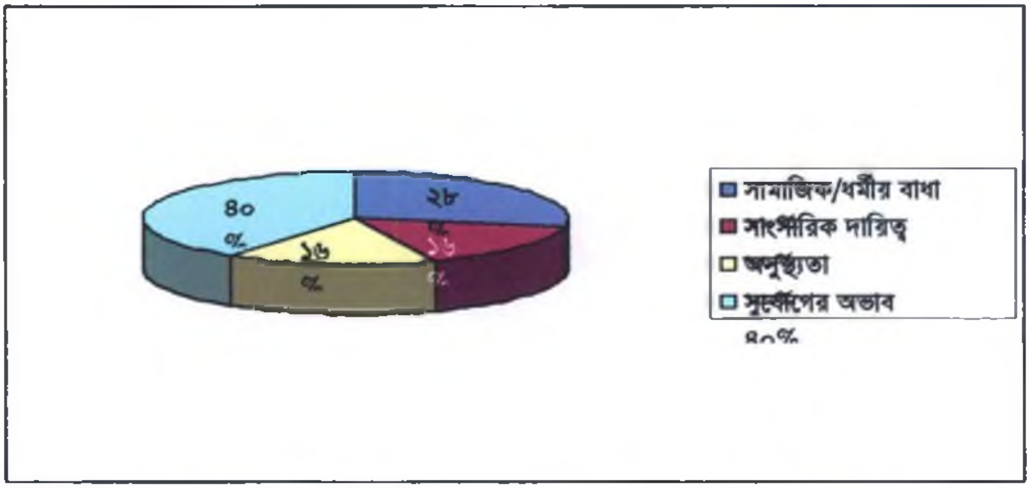

উৎসঃ সিরডাপ (১৯৯৩): বাংলাদেশের দরিদ্রতা এবং মনিটরিং সমন্বয়, ১৯৯৩।

গ) **সংবিধান প্রণীত আইন কানুনঃ** আমাদের দেশের সংবিধানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষকে সমঅধিকার দেওয়া হলেও বাস্তবে এগুলোর প্রয়োগ হচ্ছে না। দেখা যায় সমাজে পুরুষরাই সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব সব ক্ষেত্রেই আইনের কাঠামোগত দুর্বলতায় নারী হয় বঞ্চিত, যা নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

ঘ) **রক্ষণশীলতাঃ** সমাজে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন কিছু লোক নারীকে সবক্ষেত্রে দমিয়ে রাখতে চায়। নারী মুক্তিকে তারা ধর্মের চরম অবমাননা বলে মনে করে। এটি নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা।

ঙ) **শিক্ষাঃ** আমাদের দেশের নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। ফলে তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না।

ক্ষমতায়নের পূর্বশর্ত

দু একজন নারী সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা মুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেই নারীর ক্ষমতায়ন হয় না। নারীর ক্ষমতায়ন দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ যে নারী তাদের সঠিক ক্ষমতায়নকে বোঝায়। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা ঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী সমাজ পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। জাতীয় ভিত্তিতে বাংলাদেশে মহিলাদের যে চিত্র পাওয়া যায় তা হতাশাব্যঞ্জক। নারীকে ক্ষমতায়িত করতে হলে শিক্ষার উপর বিশেষ জোড় দিতে হবে।

অংশগ্রহণ ঃ ক্ষমতায়নের আরেকটি অপরিহার্য দিক হলো নারীর সার্বিক অংশগ্রহণ। সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতা নিশ্চিত হয়। তাই নারীকে সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহনের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

অর্থনৈতিক মুক্তিঃ নারীর ক্ষমতায়নের অপর একটি গুরত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা এখনও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা তাদের ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

নারীর স্বার্থরক্ষাকারী আইন প্রণয়ণঃ বিয়ে, বিবাহ, বিচ্ছেদ, সন্তান ধারণেরপূর্ণ স্বাধীনতা, সম্পত্তিতে সমঅধিকার, সন্তানের অভিভাবকত্ব প্রভৃতি বিষয়ে সনাতন আইন পালটে নারী পুরুষের সমান স্বার্থ রক্ষাকারী আইন প্রবর্তন করতে হবে।

নারীর কাজে স্বীকৃতিঃ নারীকে তার কাজের যথাযথ স্বীকৃতি দিতে হবে। সন্তান লালন ও গৃহস্থলি কাজকে কিছুতেই ছোট করে দেখা যাবে না। বরং পুরুষকেও এসব কাজে সমানভাবে এগিয়ে আসতে হবে যাতে নারী পুরুষ উভয়ই ঘরে বাইরে সমানভাবে কাজে অংশ নিতে পারে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন নারীদের সব ধরনের প্রতিবন্ধকতার অবসান। বিশেষভাবে প্রয়োজন নারী শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি।

নারী উন্নয়নে সরকারী পদক্ষেপ সমূহ

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সরকার সমাজের সকল স্তরে নারী সমাজের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা নারীর সম অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

নারী উন্নয়নের প্রধান দিক নিদের্শনা এ.এফ. এ বেইজিং ফ্লাট ফরম ফর এ্যাকশন বাস্ত বায়নের জন্য সরকার ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে (NAP)। এই জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা বা নারী উন্নয়নকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করে নারীকে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমান অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠা করার একটি অঙ্গীকার।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা ও এ্যাডভোকেসি ভূমিকাকে শক্তিশালী করতে মন্ত্রণালয়ের এ্যালোকেশন অফ বিজনেস সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আর্থ সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করতে সরকার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯১-৯৫) ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক কাঠামোতে উন্নয়ন নারী (WID) এবং জেন্ডার (GAD)- কে সম্পৃক্ত, করছে। বর্তমানে ৪৭টি মন্ত্রণালয় উইড ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করে সরকার নারী উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। সর্বোপরি নীতিমালা প্রণয়ন ও সচিবালয়গুলোর সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য নারী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে (সিদ্দিকী, ২০০২ঃ১০৬-৭)। সরকার কর্তৃক গৃহীত এ সকল পদক্ষেপ নারী উন্নয়নের পথ প্রসারিত করছে। তবে নারী উন্নয়নের ধারাকে আরও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

১৯৮৪ সালের ৬ নভেম্বর বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের সিডও সনদ অনুমোদন করে। সিডও বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৬টি ধারায় নারী পুরুষের সমতা সম্পর্কিত ৩টি ধারা ১৯৮৪ সালের সরকার অনুমোদন দেয়নি। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে ধারা ১৩ (ক) ও ১৬-১ (গ) ও (চ) এর উপর থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়। এছাড়া নারীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষায় সরকার বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছেন। ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ১৯৯৮ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন।

সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকার নতুন আইন পাশ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে স্থানীয় সরকারের ৪টি স্তরেই মহিলারা অংশগ্রহণ করছেন। ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৭৯ জন নারী সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে পরিষদসমূহের প্রতিনিধিত্ব করছেন। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও নারীদের অংশগ্রহনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীদের জন্যে বিশেষ কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১। স্থানীয় সরকার কাঠামোর প্রত্যেক স্তরেই নারীদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত পদে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২। স্থানীয় সরকারের ১২টি স্ট্যান্ডিং কমিটি রয়েছে তার এক তৃতীয়াংশ কমিটির সভাপতি থাকবে নারী সদস্যগণ।

৩। ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পে তিন ভাগের এক ভাগ সভাপতি থাকবে নারী সদস্যগণ।

৪। একটি ইউনিয়ন পরিষদের ৫০ হাজার টাকা মূল্যের যতটি উন্নয়ন প্রকল্প নেয়া হবে তার এক তৃতীয়াংশ প্রকল্পের সভাপতি থাকবেন নারী সদস্যগণ।

অর্থনীতিতে নারীদের সম্পৃক্তকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন নারীদের জন্য কৃষি ঋণ, সোনালী ব্যাংক কর্তৃক বিনা জামানতে ঢাকা শহরের প্রান্তিক পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে সহজ কিস্তিতে ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান, জনতা ব্যাংক হতে গ্রামের পিছিয়ে পরা নারীদের জন্য ঋণ প্রদান। বিসিক কর্তৃক নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা।

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ দিয়েছেন। মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়াশুনার পাশাপাশি উপবৃত্তি চালু রেখেছেন। এতে মেয়েরা অধিক হারে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষা ছাড়াও সাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। এছাড়া সরকার কর্তৃক শিশুদের জন্য জাতীয় নীতিমালা ১৯৯৭-২০০২ গ্রহণ করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় আগের তুলনায় অনেক উন্নতি হয়েছে।

বাংলাদেশের সকল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখিত ছিল না। নারী ইস্যু এসেছে কেবল মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের পুর্ণবাসনের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ খাতের অধীনে (চৌধুরী, ১৯৯৪:৯৪)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) এবং তৃতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) নারী উন্নয়নের বিষয়টি স্থান পায় এবং বিশেষ ও পৃথক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) প্রথমবারে মত 'মূলধারা' এবং 'লিঙ্গ' এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় এবং 'উন্নয়ন পরিকল্পনায় মুলধারায় নারীদের নিয়ে আসা' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে গৃহীত হয় (Jahan, 1985:26)। এছাড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) এর লক্ষ্য হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য কমিয়ে আনা।

অন্যদিকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ শিক্ষা ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষ্যম্যের বিষয়টি বিবেচনা করছে। পাশাপশি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ৬০% আসন নারীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ডাকার শিক্ষা সম্মেলন ২০০০-এ যোগদান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং যা EFA এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অবকাঠামো প্রদান করার অঙ্গীকার করে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ডাকার সম্মেলনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা (২০০০-২০০৫) প্রণয়ন করে। সরকারের এসব পদক্ষেপ সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে (সিদ্দিকী, ২০০২ঃ১০৮)। এছাড়া সরকারী চাকুরিতে গেজেটেড পদের জন্য ১০ ভাগ এবং নন গেজেটেড পদের জন্য ১৫ ভাগ কোটা নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সেনাবাহিনীতে নৌ বাহিনীতে নিয়মিত নারী অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। নারীদের স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের জন্যে যে সকল পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সেগুলো হলোঃ

১। বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য পরিচর্যায় একক সার্ভিস গড়ে তুলতে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা প্রকল্প গ্রহণ।

২। থানা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনার পরিকল্পনা কমপ্লেক্স গঠন।

৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কমপ্লেক্স গঠন।

৪। গ্রাম পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান (জলি, ২০০৪:৮)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, গত তিন দশকে নারীর অবস্থার কিছুটা উন্নয়ন সাধিত হয়েছে এবং নারীরা সম-অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে; তারপরেও অনেক নারী এখনও বৈষম্য ও অন্যায়ের শিকার হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর সম্পৃক্ততাকে আরও সক্রিয় করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে সরকারি অবস্থানকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। জেন্ডার সংবেদনশীল সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তরের নারী পুরুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। আর এ জন্যে প্রয়োজন সর্বক্ষেত্রে সচেতনতা। অন্যদিকে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াবার মধ্যে দিয়েই নারীর ক্ষমতায়ণ সম্ভব হবে। স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াবার জন্য ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, জাতীয় পর্যায়ে নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে তেমনি পদক্ষেপ নিতে হবে।

গ্রাম সরকার

উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ কথাটি বেশ ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে দেশের আপামর জনসাধারণ যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা কারো দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে তখন তাকে জনগণের অংশগ্রহণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় সব সমাজেই সার্বিক উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল।

জনগণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গ্রাম সরকার ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। গ্রামে ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হচ্ছে গ্রাম সরকার। গ্রাম পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের ধারণাটি নতুন নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই উপমহাদেশে গ্রাম সরকারের অস্তিত্ব দেখা যায়। ১৮৩০ সালে চার্লস মেটকাফে এদেশের গ্রামগুলোকে Little Republic হিসেবে আক্ষায়িত করেছেন (Alderfer, 1974:233)। সুলতানী ও মোঘল শাসনামলেও গ্রাম সরকার কাঠামো ছিলো। এবং এদের পরিচালনা ব্যবস্থা ছিলো সুন্দর। জনৈক ইংরেজ তার বইয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা এভাবে তুলে ধরেছেন, ... a wonderful land whose richness and abundance neither war, partilence nor oppression could destroy (Ahmed, 1964:75)

পরবর্তীতে বৃটিশ শাসনামলে ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যের মুখে পরে। কারণ তাদের শোষণ ও বঞ্চনা গ্রাম সরকার কাঠামো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। পাকিস্তান শাসনামলেও এর কাজ মন্থর গতিতে চলতে দেখা যায়।

দেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর নিজস্ব উদ্যোগে কুমিল্লার 'সবুজ' নামে সর্বপ্রথম গ্রাম পুণর্গঠন কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে তাদের এই উদ্যোগ বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় রাজশাহীতে "অগ্রণী' বরিশাল 'সোনালী' নোয়াখালী 'সুজলা' ঢাকায় স্বনির্ভর ইত্যাদি নামে ছড়িয়ে পড়ে (Ali, 1971:86)। ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৪-২৫ তারিখে জয়দেবপুর ধান গবেষণা কেন্দ্রে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে 'স্বনির্ভর' কথাটি সর্বপ্রথম দেশের জন্য প্রযোজ্য হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন থানার স্বনির্ভর কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮০ সালের ১০ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সাভারে স্বনির্ভর গ্রাম উদ্বোধন করে এর সূচনা পর্ব শুরু করে। পরবর্তীতে

তিনি ১৯৮০ সালের ৩০ ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সমগ্র দেশে গ্রাম সরকার গঠনের জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন (চাষী, ১৯৮১:৫)। তার এই ঘোষণার প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় গ্রাম সরকার বিধিমালা প্রণয়ন করেন।

Peter J. Bertocci গ্রাম সরকার সম্পর্কে বলেছেন- ... Individuals representing functional and interest groups in each local community do attempt, for the first time in East Bengals modern history, to establish politico-administrative entities at the village level (Bertocci, 1982:123). জিয়ার গ্রাম সরকার পূর্বের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্য থাকলেও হুবহু মিল নেই জনগণকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যই গ্রাম সরকার প্রবর্তিত হয়, পক্ষান্তরে পঞ্চায়েতে জনগণকে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। পূর্বের গ্রাম ব্যবস্থা ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে বিবর্তিত হয়েছে এবং ভূমির মালিকানা পঞ্চায়েতের হাতে ছিল। কৃষি কাঠামোতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। কিন্তু গ্রাম সরকার ভূমির মালিকানা স্বীকার করেই তার কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল।

পরিকল্পনা কমিশন ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম সরকারকে ১৯৮০-৮৫ সাল পর্যন্ত গ্রামের মানুষের উন্নয়নে ইহাকে স্থানীয় সম্ভাবনার লিংকপিন হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন যে- Decentralization dvelopment ecivities will become imperative.

প্রেসিডেন্ট জিয়া মূলতঃ গ্রামের মানুষকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার লোকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন ছিলো তার অন্যতম লক্ষ্য। সে কারণেই ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে গ্রাম সরকারের কমিটি গঠনের উদ্যোগেও তিনি নিয়েছিলেন।

অনেকের মতে গ্রাম সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্য নয় উভয়ের মধ্যে ক্ষমতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকারের মাধ্যমে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল বলে যে অপবাদ রয়েছে তা সঠিক নয়। সরকারের বিকেন্দ্রীকরণই ছিল গ্রাম সরকারের লক্ষ্য। সবচেয়ে বড় কথা দেশের ভিতর (Micro) উন্নয়ন পরিকল্পনা খুলে দেয় গ্রাম সরকার। যার মাধ্যমে দেশের ভেতর উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছিল।

তৃণমুল পর্যায়ে গ্রামীন জনগণকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা ও তাদের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক সংগঠন হিসাবে বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয়

সংসদে পূনরায় গ্রাম সরকার আইন ২০০৩ আইন পাশ করেছে। এই আইনের ফলে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভূক্ত ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি গ্রাম সরকার গঠিত হয়।

গ্রাম সরকারের গঠন ঃ গ্রাম সরকারের একজন প্রধান। একজন উপদেষ্টা এবং ১০টি শ্রেণী বা ক্যাটাগরীর ১৩ জন সদস্য থাকবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি গ্রাম সরকারের পরিচালনাকারী কতৃপক্ষ হিসাবে গন্য হবেন।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডের সাধারণ নির্বাচিত সদস্য পদাধিকার বলে গ্রাম সরকার প্রধান হিসাবে অভিষিক্ত হবেন এবং তিনটি সাধারণ ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে নির্বাচিত মহিলা সদস্য তাঁর নির্বাচনী এলাকার অধীন তিনি গ্রাম সরকারেরই উপদেষ্টা হিসাবে গণ্য হবে।

নিম্ন বর্ণিত ১০টি ক্যাটাগরীতে ১৩ জন সদস্য পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ও সভাপতিত্বে এলাকার মোট ভোটারের অন্যূন এক দশমাংশের উপস্থিতিতে সদস্যগণ মনোনীত হবেন। সাধারণ সমঝোতা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে সদস্যগণ মনোনীত হবেন তবে কোন ক্ষেত্রে মতদ্বৈততা দেখা দিলে পরিচালনাকারী কর্মকর্তার মতামত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কোন একটি বিশেষ প্রতিনিধি পাওয়া না গেলে কৃষক সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে। গ্রাম সরকার প্রধানের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালনের জন্য গ্রাম গঠনের পর প্রথম সভাতেই তিন সদস্যের একটি প্যানেল গঠিত হবে। ঐ প্যানেল অবশ্যই একজন মহিলা সদস্য থাকবেন। প্রধানের অনুপস্থিতিতে প্যানেলে থেকে ক্রমানুসারে প্রদানের দায়িত্ব পালন করবেন।

রেখাচিত্র ২.৩ঃ গ্রাম সরকার কাঠামো

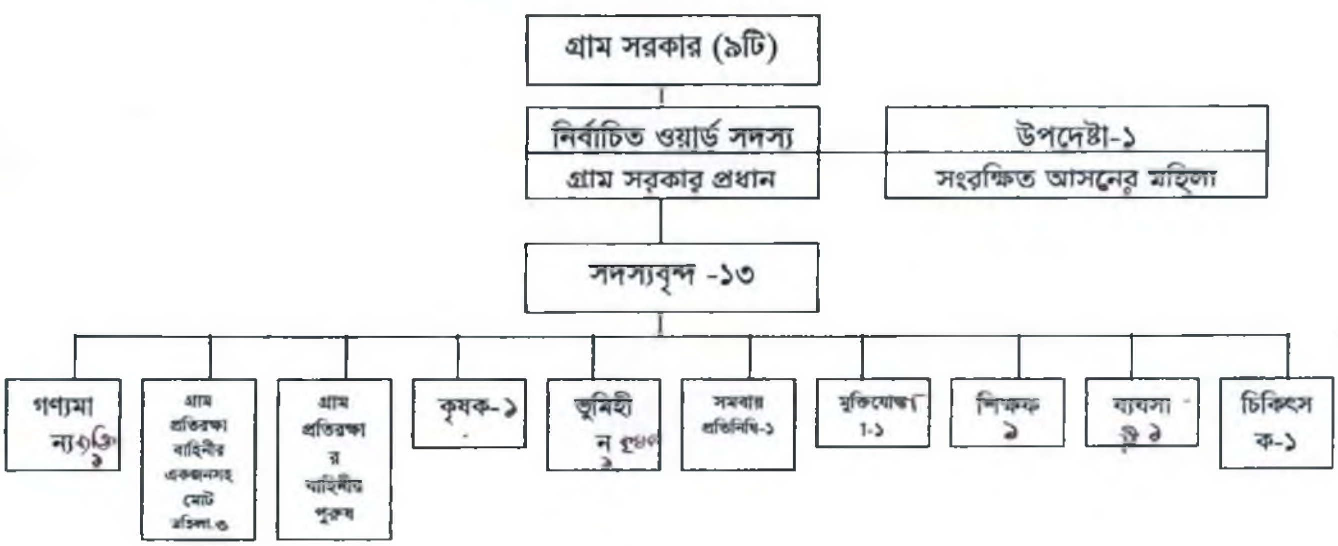

গ্রাম সরকারের মেয়াদ ঃ গ্রাম সরকারের মেয়াদ হবে প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হতে পাঁচ বছর। মেয়াদ শেষ হবার ১৮০ দিনের মধ্যে নতুন গ্রাম প্রধান গঠিত হবে। আইন অনুযায়ী কোন গ্রাম সরকার বাতিল হলে ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী গ্রাম সরকার গঠিত হবে।

গ্রাম সরকারের সভা ঃ গ্রাম সরকারসমূহ সাধারণত দুই ধরনের সভা করবে। প্রথমতঃ পরিচালনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কার্যপদ্ধতির আলোকে গ্রাম সরকারের নিজস্ব সভা। প্রতিমাসে অন্যূন একটি সভা হবে। গ্রাম সরকার প্রধান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অথবা অন্যূন আট সদস্যর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সভা করা যাবে। সভা অনুষ্ঠানের তিনদিন পূর্বে সভার নোটিশে দিতে হবে এবং নোটিশ সভার আলোচ্যসূচীর উল্লেখ থাকবে। সভায় মোট সদস্যের তিন ভাগের এক অংশের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং সভায় সংখ্যগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত হবে। সভায় প্রধান উপদেষ্টা ও সদস্যদের প্রত্যেকের একটি করে ভোট থাকবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রাম সরকার একটি করে ভোট থাকবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রাম সরকার প্রধান বা সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকবে। গ্রাম সরকারের সভায় আমন্ত্রিত হলে ওয়ার্ডের আঞ্চলিক এলাকার সরকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। দ্বিতীয় ধরনের সভা হবে সাধারণ সভা। ওয়ার্ডের ভোটার তালিকার অন্তর্ভূক্ত সদস্যদের অন্যূন দশ ভাগের এক অংশে উপস্থিতিতে প্রতি ছয়মাস অন্ত র একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

কমিটি ব্যবস্থা ঃ গ্রাম সরকার যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনা করিতে পারে সেজন্য কমিটি ও উপকমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। সাধারণতঃ গ্রাম প্রধান, উপদেষ্টা বা সদস্য কমিটির সভাপতি ও সদস্য হতে পারবে। এছাড়া ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় যাদের নাম রয়েছে প্রয়োজনে তারাও কমিটির অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। কমিটিতে সর্বাধিক ৫ জন সদস্য থাকবে এবং তিনজনের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

তহবিল ঃ গ্রাম সরকারের 'গ্রাম সরকার তহবিল নামে একটি তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ এই তহবিল জমা থাকবে। তবে গ্রাম সরকারকে কোন ধরনের কর আরোপের ক্ষমতা নেই। প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ হতে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থার রয়েছে।

গ্রাম সরকারের মেয়াদ ঃ গ্রাম সরকারের মেয়াদ হবে প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হতে পাঁচ বছর। মেয়াদ শেষ হবার ১৮০ দিনের মধ্যে নতুন গ্রাম প্রধান গঠিত হবে। আইন অনুযায়ী কোন গ্রাম সরকার বাতিল হলে ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী গ্রাম সরকার গঠিত হবে।

গ্রাম সরকারের সভা ঃ গ্রাম সরকারসমূহ সাধারণত দুই ধরনের সভা করবে। প্রথমতঃ পরিচালনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কার্যপদ্ধতির আলোকে গ্রাম সরকারের নিজস্ব সভা। প্রতিমাসে অন্যূন একটি সভা হবে। গ্রাম সরকার প্রধান স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অথবা অন্যূন আট সদস্যর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ সভা করা যাবে। সভা অনুষ্ঠানের তিনদিন পূর্বে সভার নোটিশে দিতে হবে এবং নোটিশ সভার আলোচ্যসূচীর উল্লেখ থাকবে। সভায় মোট সদস্যের তিন ভাগের এক অংশের উপস্থিতিতে কোরাম হবে এবং সভায় সংখ্যগরিষ্ঠের ভোটে সিদ্ধান্ত হবে। সভায় প্রধান উপদেষ্টা ও সদস্যদের প্রত্যেকের একটি করে ভোট থাকবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রাম সরকার একটি করে ভোট থাকবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রাম সরকার প্রধান বা সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকবে। গ্রাম সরকারের সভায় আমন্ত্রিত হলে ওয়ার্ডের আঞ্চলিক এলাকার সরকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকতে পারবেন। তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। দ্বিতীয় ধরনের সভা হবে সাধারণ সভা। ওয়ার্ডের ভোটার তালিকার অন্তর্ভূক্ত সদস্যদের অন্যূন দশ ভাগের এক অংশে উপস্থিতিতে প্রতি ছয়মাস অন্তর একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই সভায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

কমিটি ব্যবস্থা ঃ গ্রাম সরকার যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনা করিতে পারে সেজন্য কমিটি ও উপকমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। সাধারণতঃ গ্রাম প্রধান, উপদেষ্টা বা সদস্য কমিটির সভাপতি ও সদস্য হতে পারবে। এছাড়া ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় যাদের নাম রয়েছে প্রয়োজনে তারাও কমিটির অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। কমিটিতে সর্বাধিক ৫ জন সদস্য থাকবে এবং তিনজনের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

তহবিল ঃ গ্রাম সরকারের 'গ্রাম সরকার তহবিল নামে একটি তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ এই তহবিল জমা থাকবে। তবে গ্রাম সরকারকে কোন ধরনের কর আরোপের ক্ষমতা নেই। প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ হতে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থার রয়েছে।

পরিদর্শন ও তদন্ত ঃ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রাম পরিষদ পরিদর্শন করতে পারবে। গ্রাম সরকার জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করলে এবং তা তদন্তে প্রমাণিত হলে জেলা প্রশাসক গ্রাম সরকার বাতিল করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গ্রাম সরকারের কার্যাবলী ঃ গ্রাম সরকার ইউনিয়ন পরিষদের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিম্ন তালিকাভুক্ত ১৬টি কাজ সম্পাদন করবে।

১। গ্রামের রাস্তাঘাট, কালভার্ট ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, চলমান প্রকল্পের অগ্রগতি ও আর্থিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করা;

২। নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ সুষ্ঠু আইন শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদে পেশ করা;

৩। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী তদারক করা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় মাদ্রাসা ও মক্তবে শিক্ষাদান পাঠক্রমের খোঁজ-খবর রাখা ও সেই সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিবেদন প্রেরণ করা;

৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী সকাল শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা এবং কোন শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ অভিভাবককে উদ্বুদ্ধকরণে ব্যর্থ হলে তা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন প্রেরণে করা;

৫। পুষ্টি ও টীকাদান কর্মসূচীসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং মাঠ পর্যায়ে উক্ত কর্মসূচীতে কর্মরত কর্মচারীদের কাজ সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করা;

৬। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য সহযোগিতা করা এবং মাঠ পর্যায়ে উক্ত কর্মসূচীতে কর্মরত কর্মচারীদের কাজ সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদে প্রতিবেদন পেশ করা;

৭। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা।

৮। জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কিত প্রাথমিক হিসাব সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা এবং ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করা;

৯। কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সার উন্নতমানের বীজ এবং কীটনাশক সরবরাহ প্রসঙ্গে নিয়মিতভাবে অবহিত থাকা এবং এই বিষয়ে সংকট দেখা দিলে সংগে সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা;

১০। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

১১। ভি, ডি, এফ ও ভি, জি, ডি কার্যক্রম তদারক করা এবং কোথাও এ সংক্রান্ত কোন অনিয়ম দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১২। গ্রামের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

১৩। গ্রামের অসহায় মহিলা ও শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা যাতে করে তারা সার্বিক ভাবে উপকৃত হয়;

১৪। আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকারের সমন্বয়

ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকারের কাঠামো, অস্তিত্ব সবই ভিন্ন। তবে দুটো প্রতিষ্ঠানই গ্রামের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনা গুলি আপামর জনসাধারণের কল্যানের জন্য প্রণীত হয়েছে। কিন্তু তারা একই সাথে কাজ করতে গিয়ে কখনও যদি কোন্দলের সৃষ্টি হয় তবে গ্রামবাসীর জন্য তা হবে চরম বিপর্যয়কর। সে জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান সহাবস্থানের ভিত্তিতে গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে।

গ্রাম সরকার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বিকল বা দুর্বল না হয়ে আরো শক্তিশালী স্থানীয় সরকার হিসেবে গড়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারেও দৈনন্দিন ভিত্তিতে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদকে যেন দেখা যায় গ্রাম সরকারকে সঙ্গী পেয়ে হঠাৎ করে জেগে উঠেছে। এর আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। গ্রাম সরকারটি হচ্ছে অনেকটা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে একটু এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ বা প্রচেষ্টার মতো একটা কিছু। গ্রাম সরকার কোন মূল স্তর নয় এটাকে একটা হাফ স্তর হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। (ইউনুস, ২০০৩:৫)। গ্রাম সরকারের মূল ভূমিকা হতে পারে ইউনিয়ন পরিষদের ওপর একটা জবাবদিহিতা সৃষ্টি করা।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে তার নতুন দায়িত্ব সুন্দর ভাবে বুঝে নিতে হবে। তিনি এখন গ্রাম সরকার ব্যবস্থার মধ্যেমনি। তার প্রধান কাজ হবে সারা ইউনিয়নে উদ্যম সৃষ্টির জন্য

সকল গ্রাম সরকার প্রধানের মধ্যে । বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া। তিনি গ্রাম সরকার প্রধানের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করলে মারাত্মক ভুল করবেন। তাকে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ভাবে গ্রাম সরকার প্রধানদের নিয়ে একসাথে কাজ করলে তার পূর্বের ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে।

গ্রাম উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা

স্বাধীনতার পর থেকে বেসরকারী এবং ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের সাহায্যার্থে কাজ করছিল। প্রথমদিকে তাদের কার্যক্রম কেন্দ্রীভূত ছিল ত্রাণ এবং পূণর্বাসন ক্ষেত্রে পরে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষায়। সম্প্রতি এই ধরনের অনেক সংগঠন আয় সৃষ্টিকারী কাজ কর্মের উপর জোর দিচ্ছে। যাতে করে দরিদ্র জনগণ স্বাবলম্বী এবং আত্মনির্ভরশীল হতে পারে (সিদ্দিকী, ১৯৮৫ঃ৮৩)। বাংলাদেশে বেসরকারী সংস্থা (এন.জি.ও) পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা করছে। এসব এন.জি.ও প্রধানত সমাজের দুঃস্থ ও অসুবিধাগ্রস্থ লোকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।

বেসরকারী সংস্থাগুলি কৃষি, হস্তশিল্প, গ্রামীণ শিল্প খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, আত্মকর্মসংস্থান। অবকাঠামো এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে আয় সৃষ্টিকারী বহু ধরনের কাজের সংগে তারা প্রশংসনীয় ভাবে যুক্ত রয়েছে। এই ধরনের কাজের সহায়তা করারজন্য অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য কেন্দ্রীক জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণের উপরও জোর দেয় (সিদ্দিকী, ১৯৮৫ঃ৮৩-৮৪)। এছাড়া তারা শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং শিশু স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা অন্যান্য সেবামূলক কার্যক্রমের সহায়তা করে পরোক্ষভাবে গ্রামীন কল্যানের জন্য কাজ করছে।

আক্ষরিক অর্থে এনজিও হচ্ছে 'নন গর্ভনমেন্টাল অর্গানাইজেশন' অর্থাৎ যে কোন বেসরকারী সরকারী সংস্থাকে এনজিও বলা যায়। নন গভর্ণমেন্টাল অরগানাইজেশন' বা বেসরকারী সংস্থা শব্দটি প্রথম অনুমোদিত হয়েছিল জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের অধীনে ২৮৮ (x) ধারায় ১৯৬০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি। সেখানে বলা হয়েছিল যে, কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা যদি আন্তঃসরকারের শর্তাধীনে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে সেটা একটা আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে। প্যাড্রণ বলেন, এনজিও হতে পারে গবেষণা প্রতিষ্ঠান পেশাদার সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন শিক্ষা ও বণিক সমিতি, যুব সংগঠন ধর্ম প্রতিষ্ঠান, প্রধান নাগরিক সমিতি, ভ্রমনকারী দল, প্রাইভেট ফাউন্ডেশন, রাজনৈতিক দল, অর্থযোগানকারী ও উন্নয়নমূলক

আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থা এবং বেসরকারী প্রকৃতির অন্য যে কোন সংগঠন (Padon, 1987:70)।

Bangladesh Development dialogue journal of SID Bangladesh Chapter a উল্লেখ করা হয়েছে- we have defined the term N.G.O as an association of persons fromed vountary through personal initiatives of a few commited persons dedicated to the disign, study and implementation of devleopment projects at the grassroots level. The work outside government structures but operate within the legal frame work of the country. They are involved in direct action oriented projects, sometimes combined with study and research. Their target population are primarily the rural poor (huda, 1984:27).

আমাদের দেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ যুগ যুগ ধরে দুঃস্থ মানবতার সেবায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক দিক দিয়ে পঙ্গু তাদের জন্য সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে সেসব প্রতিষ্ঠান সেচ্চাসেবী প্রতিষ্ঠান নামে পরিচিত (রহমান, ১৯৮০:২৬৪)।

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে আমরা বলতে পারি যে, "যখন কোন ব্যক্তি বা সংগঠন দেশী বা বিদেশী কিংবা উভয় উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একেবারে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করে তখন সেই ব্যক্তি বা সংগঠনের কাজকে বলা হয় "স্বেচ্ছামূলক কাজ" এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে "স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা" বা সংক্ষেপে এন.জি.ও নামে অভিহিত করা হয়।

এন,জি,ও, গুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গরিব ও দুঃস্থ লোকদের আর্থ-সামাজিক উন্নতিকল্পে সরাসরি কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। তারা গরিব জনগণের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলে তাদের সচেতন করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। এদের উদ্দেশ্য শুধু নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা নয়। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুফল যাতে তারা ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। তাছাড়া এসব প্রতিষ্ঠান সমষ্টি উন্নয়নমূলক বেশ কিছু কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে যার সুফল সমাজের সকল শ্রেণীর লোক ভোগ করে। এন,জি,ও,গুলো মনে করে যে সমাজের গরিব জনগোষ্ঠীর যা প্রয়োজন তা হচ্ছে তাদের নিজস্ব সংগঠন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় মূলধন যার উপর ভিত্তি করে

তারা স্বাবলম্বী হতে পারে এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। এন,জি,ও,গুলো বয়স, লিঙ্গ, পেশা ও জমির পরিমাণ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন লক্ষ্য দলের মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

এনজিও দের কাজ যেখান থেকে শুরু ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্চাসেবী কার্যক্রমের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মন্দির, অনাথ-আশ্রম প্রভৃতি নির্মান ও পরিচালনার পাশাপাশি আর্তমানবতা ও স্বেচ্চাসেবীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অতীতে সম্পন্ন হতো, তবে সময়ের বিবর্তনে স্বেচ্চাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলির মনোভাব আজও বিলুপ্ত হয়নি। পঞ্চাশের দশকে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েকশত । তবে তাদের কাজের পরিধি ছিল সংক্ষিপ্ত। ১৯৫৩ সালে এদেশে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বেচ্চাসেবী কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭০ সালে ঘুর্নিঝড়ের পর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত মানুষের সাহায্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ফলস্বরূপ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা সেই সময় তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এন,জি,ও,গুলো ব্যাপক কার্যক্রম শুরু করে। এই সময় বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা তেমন সুবিধাজনক ছিল না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তখন বাংলাদেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসে এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করে। স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় "বাংলাদেশ হাসপাতাল' যে সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা দেবার জন্য সেটি স্বাধীনতার পর "গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র" নামে সংগঠিত হয়। এরপর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিলেট জেলার শাল্লা উদবাস্তুদের পুণর্বাসন কাজের মধ্যে দিয়ে। দরিদ্র ও ক্ষমতাহীনদের কল্যান সাধনের লক্ষ্যে কর্মোদ্যোগী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ব্রাক ছিল বাংলাদেশের প্রথম এন,জি,ও,গুলোর অন্যতম। এদের সাফল্যের পিছনে বিদেশী ব্যক্তিদের দেয়া সাহায্য সমর্থনের আংশিক ভূমিকা ছিল। সাম্প্রতিককালে ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা, ৯১ এর ঘূর্নিঝড় এবং টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলায় ৯৬-এর টর্নেডো পরবর্তী সময় এন,জি,ও,দের তৎপরতা সবার নজরে আসে। ১৯৯৫ সালে ম্যালেরিয়া উপদ্রুত এলাকায় এবং বন্যা দুর্গত এলাকাগুলোতে এনজিও সমূহের ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কার্যক্রম সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। তাদের পুণর্বাসন কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত পরিবারগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে এন,জি,ও,গুলো দরিদ্র জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মৎস, শিক্ষা, গ্রামীন জীবনের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য নানারকম কার্যক্রম গ্রহণ

করতে শুরু করে। সাম্প্রতিককালে রোহিঙ্গা শরনার্থী পুণর্বাসন কাজে এই আগ্রহের ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

বর্তমানে এন,জি,ও,সমুহ গ্রামবাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা গ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তাদের সংগঠনের আদর্শ অনুসারে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে মানুষকে সাহায্য করছে। এতে করে গ্রামের সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। উপরন্ত গ্রামের বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়নে বিভিন্ন সহযোগিতার ফলে গ্রামের সনাতন চেহারার পরিবর্তন হয়ে আধুনিক রূপ লাভ করছে।

বস্তুত ১৯৭৩ সালের শেষদিকে সীমিত পরিসরে উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করে। প্রথম দিকে এদের কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। তন্মধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র, দূরীকরণ, নারী অধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবেশ উন্নয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আর এক্ষেত্রে এনজিও সমূহ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিতে গ্রাম বাংলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যায়ে এনজিও সমূহ লক্ষ্যদান কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে গ্রামীন দরিদ্রদের সংগঠিত করে সমিতি বা দল গঠন করে সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করছে। এন,জি,ও,সমূহ দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে উন্নয়নের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। যেমন ঋণ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, মৌলিক চাহিদা পূরণ জনিত সকল সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও নানা ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এনজিওদের প্রকারভেদঃ বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে যে সমস্ত এনজিও কাজ করছে তাদেরকে ৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়-

1. Donor Agencies
2. International Action NGO's
3. National Action NGO's
4. Local Action NGO's and
5. Service NGO's (Huda, 1984:27)।

এনজিও গুলোর বৈশিষ্ট্যঃ

১। বড় বড় এন,জি,ও,গুলো অনেক কর্মী ও পর্যাপ্ত সম্পদ নিয়ে ছোট একটি এলাকায় তাদের কর্মকান্ড ও কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখে। ফলে দৃশ্যমান সুফল অতি অল্প সময়েই চোখে পড়ে তবে এসব প্রচেষ্টা অন্যান্য এলাকায় সম্প্রসারণ সম্ভব হয় না কারণ তাতে প্রচুর জনশক্তি ও অর্থের প্রয়োজন হয়।

২। এন,জি,ও,গুলো প্রয়োজনীয় অর্থ বিদেশী সংস্থা হতে সংগ্রহ করে। ফলে অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হয়।

৩। এন,জি,ওদের নিজেদের মধ্যে বা এন,জি,ও, ও সরকারি বিভাগ সমূহের উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় থাকে না। তাই একই এলাকায় সরকার ও এন,জি,ও,দের একই ক্ষেত্রে একাধিক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হওয়ায় সম্পদ ও জনশক্তির অপচয় ঘটে।

৪। এনজিওদের কর্মকান্ড কিরূপ হবে। তারা কি ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে সে সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই গ্রহণ করে থাকে এতে জনগণের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। কেবলমাত্র বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তাদেরকে অংশগ্রহন করতে হয়।

এনজিওদের উদ্দেশ্যঃ এনজিওগুলো বেশ কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তাদের কার্যপরিচালনা করে থাকে। তাদের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ।

ক. গরিব ও দুঃস্থ লোকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি করা।

খ. নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে তাদের অধিক হারে সচেতন করা।

গ. উন্নয়ন কর্মকান্ডের সুফল যাতে সমাজের সকল শ্রেণী ভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

ঘ. সমাজের অসচেতন জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।

ঙ. সমাজের যে বৈষম্যগুলো মানুষকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে রেখেছে তা সমাজ হতে দূর করা।

চ. একটি এলাকার উন্নতি করে অন্য এলাকায় এ ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

ছ. সমাজের প্রতিটি পর্যায় মহিলাদের অধিকার স্থাপন।

জ. স্থানীয় মহাজনদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা।

ঝ. দরিদ্রদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সক্ষম করে তোলা।

ঞ. অব্যবহৃত মানব সম্পদের জন্যে আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ট. পল্লীর জনগনের সহজভাবে ঋণের নিশ্চয়তা প্রদানে বিকল্প ব্যাংকিং পদ্ধতি পরিচালনা করা।

ঠ. উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে বস্তুগত সহায়তা প্রদান।

ড. পরিবেশগত সমতা আনয়নে পরিবেশের বিনাশ রোধ করা।

ঢ. সার্বিক কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য টার্গেট গ্রুপের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন।

এছাড়াও জনগণকে আলোচনাধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবনঘনিষ্ট বিষয়াবলি সম্পর্কে ধারনা প্রদান করা।

সারণী ২.৬ঃ বিভিন্ন বৎসর দেশী ও বিদেশী এনজিওর সংখ্যা

সাল/জুলাই-জুন	স্থানীয়	বিদেশী	সর্বমোট
৯০	২৯৩	৮৯	৩৮২
১৯৯০-১৯৯১	৩৯৫	৯৯	৪৯৪
১৯৯১-১৯৯২	৫২৩	১১১	৬৩৪
১৯৯২-১৯৯৩	৬০০	১২৫	৭২৫
১৯৯৩-১৯৯৪	৬৮৩	১২৪	৮০৭
১৯৯৪-১৯৯৫	৭৯০	১২৯	৯১৯
১৯৯৫-১৯৯৬	৮৮৭	১৩৪	১০২১
১৯৯৬-১৯৯৭	১০০২	১৪১	১১৪৩
১৯৯৭-১৯৯৮	১১০২	১৪৯	১২৫১
১৯৯৮-১৯৯৯	১২২১	১৫২	১৩৭৩
১৯৯৯-২০০০	১৩৫৪	১৬৪	১৫১৮
২০০০-২০০১	১৪৫৫	১৬৯	১৬২৪
২০০১-২০০২	১৫০০	১৭৯	১৬৭৯
২০০২-২০০৩	১৬১৩	১৭৮	১৭৯১
২০০৩-২০০৪(জুন)	১৬৯১	১৮৪	১৮৭৫

Source: NGO Affairs Bureau, Prime ministers office computer section, 2004.

সারণী ২.৭ ঃ বর্তমানে নিবন্ধনকৃত এনজিওর সংখ্যা(২০০৪)

এনজিও	সংখ্যা
দেশী	১৬৯১
বিদেশী	১৮৪
মোট	১৮৭৫

Source: NGO Affairs Bureau, Prime Ministrers office..

এনজিওদের কাজ ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে দেশী এবং বিদেশী এনজিও তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদের কাজের ধরন বিভিন্ন প্রকৃতির। এনজিওগুলো শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। নিম্নে তাদের কিছু কাজ তুলে ধরা হলো।

ক. **স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমঃ** স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে বাংলাদেশের এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে গ্রামের জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতন হওয়ায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যযত্নের সুযোগ সুবিধার অভাব গ্রামীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলা ও শিশুরা বেশী সমস্যাগ্রস্থ। উপরোক্ত ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততার কারণে গ্রামীন সমাজে মহামারী হিসেবে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করে থাকে। গরিব জনগণের দুর্বল স্বাস্থ্য ও অসুস্থ্যতা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ব্যাহত করছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব হলে গ্রামীন জনগণ তাদেব অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবদান রাখতে পারবে। বর্তমানে এনজিও গুলো স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে সব কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে তা নিম্নরূপঃ

১। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম;

২। মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা;

৩। প্রসুতি পরিচর্যা ও মাতৃসেবা কেন্দ্র পরিচালনা;

৪। টিকাদান কার্যক্রম

৫। ভিটামিন-এ ক্যাপসুল বিতরন;

৬। ধাত্রী প্রশিক্ষণ;

৭। হাসপাতাল ও ক্লিনিক পরিচালনা;

৮। অস্থায়ী ও ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র পরিচালনা;

৯। পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম

১০। গলগ্রহ রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম

১১। কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম

১২। এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম

১৩। চক্ষু শিবির ও অন্ধত্ব নিবারণ কার্যক্রম

১৪। জন্ম নিয়ন্ত্রন সামগ্রী বিতরণ ও ব্যবহার নিশ্চিত করণ

১৫। জন্ম নিয়ন্ত্রনের জন্য ক্লিনিকাল সুবিধা প্রদান

১৬। কৈশর জীবনে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন

১৭। খাবার সেলাইন তৈরী

১৮। ওষুধ ও পথ্য বিতরণ (রশীদ, ১৯৯৬ ঃ ১৭-১৮)

স্বাস্থ্য অধিকার হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ এই অধিকার হতে বঞ্চিত। সরকারের একার পক্ষে এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সে কারণেই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করে থাকে। তাদের এই সেবা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কিছুটা হলেও উপকৃত করে থাকে।

খ. **সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রমঃ** শিক্ষার অভাব একদিকে যেমন ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর অন্যদিকে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাধাস্বরূপ। এই কথাটি বিবেচনা করেই এনজিওগুলো আনুষাঙ্গিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহন করে থাকে।

গ) **ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ঃ** উন্নয়নের একটি গুরুত্বপুর্ণ কৌশল হচ্ছে দরিদ্র ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থাকরণ যা তাদের দারিদ্র্যের দাসত্ব থেকে রক্ষা করবে। তাই দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য এজিনও গুলো এই ঋণ কার্যক্রম গ্রহন করে থাকে। এনজিওগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই ঋনের পরিমাণ ৪০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা। আর গ্রুপভিত্তিক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ঋণের পরিমান ৩,০০০ টাকা থাকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দিয়ে থাকে। এনজিও গুলো এই ঋণের উপর ৫% থেকে ২০% পর্যন্ত নিয়ে থাকে (রশিদ, ১৯৯৬ ঃ ২০-২১)

সিডিএফ ষ্টাডিসটিকস অনুযায়ী জুন, ২০০৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৭৭৮ এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সময় পর্যন্ত মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা ১.৪৭ কোটি এর মধ্যে ০.১৯ কোটি পুরুষ ১.২৭ কোটি মহিলা। এ সময়ে ক্রমপঞ্জীভূত মোট ২৬,৩৭৬.০৯ কোটি টাকা সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়। এই ক্ষুদ্রঋন আদায়ের হার ৯৭.১৭ শতাংশ। মোট সঞ্চয়ের পরিমান ১৫৭.৪৬ কোটি টাকা। এই ক্ষুদ্র ঋণের ৪১.৭৯ শতাংশ বিনিয়োগ হয় ক্ষুদ্র ব্যবসায় ১২.৩১ শতাংশ কৃষি, ১৭.৬৪ শতাংশ পশু সম্পদ এবং ৭.৩৯ শতাংশ মৎসখাত। বাংলাদেশের ৯টি সংস্থা ব্রাক, আশা, প্রশিকা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, টিএম এম এস, কারিতাস, আর

ডি আর এস, বি ইউ আর ও এবং শক্তি ফাউন্ডেশন মোট ক্ষুদ্র ঋণের সর্বোচ্চ অংশ বিতরণ করে থাকে। এ সব ঋনের শতকরা ২৪.৮৪ ভাগ পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন হতে সংগৃহীত হয়।

সারণী ২.৮ঃ এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও ঘূর্ণীয়মান ঋণ তহবিলের উৎস

কোটি টাকায়

উৎস	জুন '০০	জুন'০১	জুন'০২	জু'০৩
	%	%	%	%
১। পি কে এস এফ	২৪.০৩	২৩.৫০	২৩.৬৪	২৪.৮৪
২। স্থানীয় ব্যাংক	১১.২৯	৯.৫১	৮.৯৯	২.৫৯
৩। বৈদেশিক অনুদান	১৬.৯৩	১৭.৪৩	১৭.৫০	১০.৫৮
৪। সদস্যদের সঞ্চয়	২৫.২৯	২৫.৭৪	২৫.৪৯	২২.৮১
৫। সার্ভিস চার্জ	১৪.০৬	১৭.২১	১৬.৫৯	২৪.১৮
৬। অন্যান্য	৮.৪০	৬.৯৭	৭.৭৯	১৫.০৯
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ সি ডি এফ

ঘ) গ্রাম ও শহর উন্নয়নঃ বাংলাদেশের এনজিও গুলো গ্রাম ও শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কাজ করে থাকে। এ সব কাজের মূল উদ্দেশ্য হলো অধিক সংখ্যক মানুষকে সর্বোচ্চ সুবিধা প্রদান করা। দেখা যায় গ্রামে দারিদ্রতা প্রকোট আকার ধারণ করায় শহরের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। এসব কথা বিবেচনা করেই এনজিও গুলো গ্রাম ও শহরের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১। মানব সম্পদ উন্নয়ন

২। উপার্জনমুখী নানা কার্যক্রম গ্রহণ

৩। কর্মসংস্থান

৪। বস্তি উন্নয়ন

৫। খালকাটা ও পুকুর সংস্কার

৬। গুচ্ছগ্রাম সৃজন

৭। ভূমিহীনদের পুর্ণবাসন

৮। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী

৯। সড়ক, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মান ও সংস্কার

১০। অবকাঠামোগত উন্নয়ন

১১। ভূমিসংস্কার কার্যক্রম (রশীদ, ১৯৯৬ ঃ ৮৭)।

ঙ)	**মহিলা উন্নয়ন কার্যক্রমঃ** বাংলাদেশের এনজিও গুলো মহিলাদের সার্বিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। আমাদের দেশের গ্রামের মহিলারা সামাজিক স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে অসুবিধা গ্রস্ত শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নানা ধরনের অত্যাচার, বৈষম্য ও শোষণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দেশী ও বিদেশী এনজিও গুলো নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। যাতে করে মহিলারা বিভিন্ন বৈষম্য হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে।

চ)	**পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পূণরুৎপাদনঃ** অধিক জনসংখ্যা ও অন্যান্য কারণে আমাদের দেশের পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পরিবেশকে রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য এনজিও গুলো বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। যেমন-

১.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী

২.	পরিবেশগত কৃষি কার্যক্রম

৩.	জীবিকা নির্বাহের অনুমোদনযোগ্য প্রকল্প, ইত্যাদি।

যদিও অসংখ্য স্থানীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং সরকারী, বেসরকারী, আধা-সরকারি সংস্থা ও এনজিও কর্তৃক আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য নিরশনকল্পে বহু প্রকার কর্মসূচী পরিচালিত হচ্চে তবু এ কথা সত্যি যে, দারিদ্র্যমোচন ও বিত্তহীনদের আর্থসামাজিক অবস্থার বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি এবং দরিদ্র জনগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা আরো খারাপ আকার ধারণ করছে। সরকারী বেসরকারী সব উদ্যোগই আসলে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট উদ্যোক্তাগণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন সাহায্যের আশায়, ভালো বেতন, গাড়ি ও ভালো বাড়ী পাওয়ার আশায়, তাই উন্নয়নের পরিবর্তে উৎপাদন সম্পর্কে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই গড়ে উঠছে। ফলে বেকারত্ব ও ভূমিহীন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে (অনীক, ১৯৮৬ ঃ ৭)। এমতাবস্থায় গ্রাম পর্যায়ে এনজিওগুলোর কাজ করার সাথে সাথে যদি গ্রাম পর্যায়ে নেতৃত্বের গুণগত মান বৃদ্ধি করা হয় তবেই হয়তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও পর্যালোচনা

বাংলাদেশে আমরা আজকে যে, স্বায়ত্তশাসিত সরকার দেখতে পাই তা একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়নি হয়েছে ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে। তাই অতীত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বিশ্লেষণের দাবী রাখে। পূর্বের স্থানীয় সরকারগুলো পর্যালোচনা করলে তাদের ক্ষমতা, কাজের ধারা সম্পর্কে জানতে পারবো। এই স্থানীয় সরকার নিজেদের এলাকার অভ্যন্তরীন সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতো। পরিষদ গ্রামে শান্তি শৃংখলা রক্ষা এবং গ্রামীবাসীদের মধ্যেকার ছোট-খাট বিরোধের মীমাংসা করতেন। নিম্নে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিবর্তনকে আমরা নিম্নোক্ত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। যথা, (ক) প্রাচীন ও মধ্য যুগ (খ) মুঘল যুগ (গ) বৃটিশ যুগ (ঘ) পাকিস্তান পর্যায় (ঙ) বাংলাদেশ পর্যায়।

(ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগঃ যদিও উপমহাদেশে আধুনিক স্থানীয় সরকার কাঠামো বৃটিশদের সৃষ্টি, তথাপিও প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলাদেশে প্রচুর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। ভিডিস্ট আমল (১৫০০-১৫০০ বিসি) ও ম্যুর শাসনকালেও স্থানীয় প্রশাসন শান্তি শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। গুপ্ত শাসনামলে শহর ও গ্রামগুলো ভুক্তি, মন্ডল, বিথি, বিসহে এবং গ্রামে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি স্তরে একজন করে শাসক থাকতেন। তারা সকলেই রাজার দ্বারা নিয়োগ পেতেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্র (১৩৪২) শাসনামলে প্রশাসনিক বিভাগ ছিল আবসা, কসবা, শহর, ইকলিম। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল (Bhogle, 1977:8-15)। পরবর্তীতে স্থানীয় সংস্থা হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েৎ দেখতে পাই যা সেই সময় জনপ্রিয় হয়েছিল। স্বয়ং সম্পূর্ণ এই গ্রামগুলোকে স্যার চার্লস মেটকাফ little Republic বলে উল্লেখ করেছেন (Alderfer, 1947:293) কেননা সে সময় গ্রামগুলো আধুনিক রাষ্ট্রের মতো সর্বসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গ্রাম সভা তথা গ্রাম প্রধান দ্বারা পরিচালিত হতো। প্রতিটি গ্রামই তার নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বশাসিত। পরিচালিত হতো নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ও নিজস্ব চাহিদা পূরণে সক্ষম। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে মৌর্য্য, গুপ্ত, পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে এবং সুলতানী আমলেও এ চরিত্র অক্ষুণ্ন ছিল।

(খ) **মুঘল যুগঃ** ১৫৭৬ সালে বাংলাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং সুবে বাংলা নাম ধারণ করে। তারা গ্রাম এলাকার উন্নয়নের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেননি। তবে কাজের সুবিধার জন্য শাসন ব্যবস্থাকে সুবা, সরকার, পরগনা এবং মাহালে বিভক্ত করেন (Qureshis, 1966:227)। মুঘলদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ছিল এদেশ থেকে স্বতন্ত্র। তারা সুদীর্ঘকাল গ্রামীন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করেনি (Nijam, 1975:216)। এই সময়ে কর প্রশাসন ও কর দাতাদের মধ্যস্থ হিসেবে কাজ করার ব্যাপারে মাতব্বরদের গুরুত্ব বৃদ্ধির ফলেই পঞ্চায়েৎ পদ্ধতির গুরুত্ব কমে আসতে থাকে (খান, ১৯৯২ঃ৩)। মুঘল যুগে প্রতিটি গ্রামে নিজস্ব পঞ্চায়েত কাউন্সিল ছিল প্রতিটি গ্রামে তারা একজন করে গ্রামপ্রধান নিযুক্ত করতেন। তিনি গ্রাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখতেন। গ্রামপ্রধান কৃষিখাত হতে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারী কোষাগারে জমা রাখতেন (Siddique, 1992:7) মুঘল শাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রমুখীন, তারা স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব স্থানীয় নেতৃত্বের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন (Sarker, 1952:p10)। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মুঘলদের কৃতিত্ব নগর প্রশাসনে। তারা কেন্দ্র থেকে গ্রাম পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের জন্য এক কার্যকরী ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন। গ্রাম পর্যায়ে এ দায়িত্ব ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত তথা গ্রাম প্রধানের। রাজস্ব আদায় ও প্রেরণের জন্য শাসকবর্গের কাছে সে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল। মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসনকে প্রধানতঃ চারটি (গ্রাম, পাড়া ইত্যাদি ধরলে ছয়টি) প্রধান ভাগ লক্ষ্য করা যায়। রাজস্ব আদায় ও শান্তি শৃঙ্খলা ইত্যাদির সুবিধার জন্য সুবে বাংলাকে এই ভাবে ভাগ করা হয়েছিলঃ

সারণী-৩.১ ঃ মুঘল আমলে বাংলার প্রশাসন

সময়সীমা	এলাকা	প্রশাসন
১৫৭৫-১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দ	সুবা	সুবেধার/নাজিম
	সরকার	ফৌজদার
	পরগণা	শিকদার (ক)
	থানা (খ)	থানাদার
	মৌজা	চৌকিদার
	মহল্ল	মহালিক (মলিক)

উৎসঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান (সম্পা) বাংলাদেশের লোক প্রশাসন সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২ পৃষ্ঠাঃ২৪

(গ) **বৃটিশ যুগঃ** মুঘল শাসনামলের শেষ ভাগে বাংলাদেশ সহ সমগ্র উপমহাদেশে নৈরাজ্য দেখা দেয় এবং বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা দখল করে। পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ভাগ গ্রাম হতে কর আদায় করতেন ও তাদের দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু ইংরেজগণ তাদের এ দায়িত্বকে খর্ব করে এদেশের একশ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি করেন (Tarachand, 1961: 294-295)। স্থানীয় এলাকার যাবতীয় দায় দায়িত্ব এই জমিদার শ্রেণীর উপর অর্পিত হয়। তারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া এই জমিদার শ্রেণী রাজস্ব আদায়ের দারিত্বই পালন করতো না গ্রামে শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল (Rashiduzzaman, 1968:1) কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৭৭৩ এর অধীনে স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে জমিদাররা ব্যর্থ হন (chaudhury, 1968:48)। কারণ বাস্তবে তারা কর আদায় ছাড়া এলাকার উন্নতি বিধানের জন্য তেমন কিছু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। এ অবস্থা চলতে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ গ্রাম বাংলায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে থাকায় বৃটিশরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হয়। ১৮৭০ সালের Annual Bengal Administration Report তারই ফল। বৃটিশগণ স্থানীয় কতৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে এবং ফলশ্রুতিতে বেংগল চৌকীদারী আইন। ১৮৭০ জারী কথা হয় (Gazettee, 1870) এই আইনের ধারা অনুসারে গ্রাম এখানকায় পঞ্চায়েত গঠিত হয়। জেলা প্রশাসন কমপক্ষে পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম ভিত্তিক চৌকিদারী পঞ্চায়েত নিয়োগ করতেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিলো শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা এবং গ্রামবাসীর নিকট হতে চৌকিদারী কর আদায় করা। এই টাকা আদায়ের মূল উদ্দেশ্য ছিলো চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করা। চৌকিদারগণ পঞ্চায়েতের দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত হত এবং পঞ্চায়েতের কথা মতো শান্তি শৃংখলা রক্ষায় সহযোগিতা করতো (Kabeer,1965:p.8)। চৌকিদারী পঞ্চায়েত গ্রামবাসীর দ্বারা নির্বাচিত কিংবা মনোনীত ছিলেন না। জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণই পঞ্চায়েতের সদস্যদের নিয়োগ করতেন। জেলা প্রশাসন ইচ্ছে করলে এদের বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখতেন। চৌকিদারী পঞ্চায়েত অবিভক্ত বাংলায় বেশ কয়েকটি জেলায় প্রচলিত ছিল। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছিল অচিরেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় (Rashiduzzaman, 1968:p-2)। কারণ চৌকিদারী খাজনা সম্পদ ও সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে কর আদায় করা হতো যা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্য ছিল না। তাছাড়া এর সদস্য মনোনয়ন পদ্ধতিও ছিল দুর্বল প্রকৃতির। এসব কারণের জন্য ১৮৭০ সালের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয় ((Gopal, 1953: 106)। ১৮৮২ সালের ১৮ মে লর্ড

রিপন ঐতিহাসিক প্রস্তাবনা ঘোষণা করেন। তার প্রস্তাবনার মধ্যে গ্রাম এলাকার জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ইউনিয়ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। তিনি ইউনিয়ন কমিটিতে পুকুর খনন, রাস্তাঘাট মেরামত ইত্যাদি জনহিতকর কাজ সন্নিবেশিত করার সুপারিশ করেন। লর্ড রিপন বিশ্বাস করতেন যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর এবং অর্থ সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের এবং রাজনৈতিক শিক্ষা প্রশাসনের মাধ্যম যা গ্রামীন জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করে সরকারের সমস্যা সমাধান কল্পে ভূমিকা রাখতে পারে (Siddique, et.al 1992:13)। এরই ফলে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন ১৮৮৫ জারী হয়। এই আইনের মাধ্যমে তিন স্তর বিশিষ্ট্য স্থানীয় সরকার কাঠামো তৈরি করা হয়, যথা- (১) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড (২) মহকুমা পর্যায়ে লোকল বোর্ড (৩) কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে ইউনিয়ন কমিটি।

১৮৮৫ সালের স্থানীয় সরকার আইনের অধীনে কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে ইউনিয়ন কমিটি গড়ে তোলা হয়, মুলতঃ সামাজিক সেবা প্রদানের উদ্দেশ্য। স্থানীয় এলাকায় নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাস্তাঘাট তৈরী মেরামত, পুকুর খনন, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের হাতে কিছু ক্ষমতা সন্নিবেশিত হয়েছিলো এই আইনে। এই আইনটি ১৮৮২ সালের রিপনের রেজুলেশনের প্রভাবে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয়েছিল (Roy, 1936:25)। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার সরকার ১৯০৮ সালে একটি সংশোধনী আনেন। এতে বিধান করা হয় যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটি তাদের সদস্যদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান করবেন (Bengal act 1885)। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার আইন লর্ড রিপনের সংস্কার প্রস্তাব দ্বারা বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এই আইন মোতাবেক স্থানীয় সংস্থাকে তিনটি স্ত রে বিভক্ত করা হয়। ভাগগুলি হলো জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়ন পরিষদ।

জেলা বোর্ড জনস্বার্থে ও উপযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন স্কুল, রাস্তাঘাট, টিকাদান, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করতো (Chowdhury, 1987:8-9)। জেলা বোর্ড ছিল কমপক্ষে নয় জন সদস্য বিশিষ্ট। দুই তৃতীয়াংশ জনগণের ভোটে নির্বাচিত। ভোটাধিকার ছিল সীমিত। বাকি সদস্যরা মনোনীত। বোর্ডের চেয়ারম্যান লেঃ গভর্নর কর্তৃক মনোনীত অথবা বোর্ডের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতো। জেলা বোর্ডকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু করা হয়। কর, ফি, জরিমানা, সরকারী অনুদান ছিল জেলা বোর্ডের আয়ের উৎস। লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন কমিটিকে জেলা বোর্ডের নিকট নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। লোকাল বোর্ডকে নিয়মিত ভাবে চাহিদাপত্র এবং পরবর্তী অর্থ বছরের সম্ভাব্য খরচের

বিরবণ জেলা বোর্ডের কাছে দাখিল করতে হতো (হোসেন, ১৯৮৯:১২-৯)। মহকুমা পর্যায়ে গঠন করা হয় লোকাল বোর্ড। সদস্য সংখ্যা কমপক্ষে ছয় জন। দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে নির্বাচিত, বাকিরা মনোনিত। চেয়ারম্যান নিয়োগ পদ্ধতি ছিল জেলা বোর্ডের অনুরূপ। ইউনিয়ন কমিটির কাজের তদারকী করা ছাড়া লোকাল বোর্ডের কোন ক্ষমতা ছিল না। লোকাল বোর্ডের কার্যাবলী তদারকী করার জন্য ১৮৮৩ সালে কলকাতায় কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হয়।

১৮৮৫ সালের আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠন করা হয় ইউনিয়ন কমিটি। পাঁচ থেকে নয় জন সদস্য মিলে এই কমিটি গঠিত হতো জনগণের ভোটে। ইউনিয়ন কমিটিকে স্বাধীনভাবে কোন কিছুর অধিকার প্রদান করেনি। সব বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তাগণ ইউনিয়ন কমিটির উপর হুকুম জারী করতেন। ইউনিয়ন কমিটি গঠনের জন্য যে নির্বাচন ব্যবস্থা করা হয়, তাও ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল যে অনুসারে অর্থ প্রদান করা হয়নি। ইউনিয়ন কমিটির উপর ছিল জেলা বোর্ডের প্রভূত নিয়ন্ত্রণ। তাই স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

১৯১৯ সালে গ্রাম স্বায়ত্তশাসন আইনে দু'স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় যথা, ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ড। ১৮৮৫ সালে স্বায়ত্তশাসন আইনে যে জেলা বোর্ড গঠিত হয় তা ১৯১৯ সালের আইনেও ঠিকই ছিল। ১৯১৯ সালের পর জেলা বোর্ডের সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে কিছু পরিবর্তন ঘটে। যে সকল জেলায় কোন লোকাল বোর্ড ছিল না যেখানে জেলা বোর্ডের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। যে সব জেলায় লোকাল বোর্ড ছিল সেখানে জেলা বোর্ডের অন্তত অর্ধেক সদস্য লোকাল বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন (রহমান, ১৯৮৮ঃ৯৩)। বোর্ডের আয়ের প্রধান উৎস ছিল সেস। ১৯৩৩ সালের সংশোধিত আইন অনুসারে জনসাধারণের উপর সেস ধার্য করা হত। প্রতি একর জমির উৎপন্ন ফসলের মূল্যের অনুর্ধ এক পঞ্চমাংশ পরিমান সেস নির্ধারণ করা হত। রাস্তা- ঘাট মেরামতের জন্য এই সেস ধার্য করা হত। রাস্তা-ঘাট মেরামতের জন্য এই সেস ধার্য করা হত। ১৮৭১ সালে সর্ব প্রথমে এই সেস ধার্য করা হয়। ফিস এবং জরিমানা থেকেও কিছু আয় হত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, জেলা, প্রদর্শণী ইত্যাদি বিষয়ের উপর থেকে ফিস আদায় করা হত (রহমান, ১৯৮৮ঃ৯৪)। জেলা বোর্ড একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হলেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রভূত। আইন প্রণয়ণের মাধ্যমে সরকার জেলা বোর্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। সরকারী কর্মকর্তাগণ বিভিন্নভাবে জেলা বোর্ডের উপর প্রভাব বিস্ত

ার করতেন। সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রণালয়ও বিভিন্ন প্রকারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারত।

স্থানীয় সরকারকে অধিকতর কার্যকর ও প্রতিনিধিত্বশীল করার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হতে থাকায় ১৯০৯ সালে মরলি-মিন্টো রিপোর্ট বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু জনগণ তা মেনে না নেওয়ায় পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে মন্টেগু চেম্‌স্‌ ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ গভর্নমেন্ট আইন ১৯১৯ জারী করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটিকে একীভূত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন বোর্ড। লোকাল বোর্ড কে অবলুপ্ত করে দ্বিস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয় (মিয়া ও আলম, ১৯৯৬ঃ৭০-৭১)। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ইউনিয়ন বোর্ড ব্যবস্থা অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রমানিত হয়। কেননা যেখানে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ইউনিয়ন কমিটি ছিল অবিভক্ত বাংলায় মাত্র ৩৮৫টি ইউনিয়ন বোর্ড গঠনের পর এই সংখ্যা দুই বৎসরে মধ্যে ২,০০০ এ উন্নীত হয়।

এই নতুন আইনে ছয়জন থেকে নয়জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হতো। এ সব সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ জেলা প্রশাসকের মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। মূলতঃ সার্কেল অফিসার মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করতেন এবং সেটি মহকুমা কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করতেন। সাধারণত ২৫ থেকে ৩৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে প্রায় ১০টি গ্রামের সমন্বয়ে ছয়হাজার থেকে আটহাজার জনঅধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে এক একটি ইউনিয়ন গঠন করা হতো (Rahman,1990:54) তবে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের এই পদ্ধতি ছিল অগণতান্ত্রিক। মূলতঃ এই সময় থেকেই গ্রাম বাংলার মানুষ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। এন,সি রায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, বাঙালী আজ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো (Roy, 1936:38)। স্থানীয় সরকার কাঠামোর অপর উল্লেখযোগ্য দিগটি হচ্ছে শহর কেন্দ্রীক স্থানীয় সরকার। ১৭৯৩ সালের সনদ আইনের বিধান মতে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে বৃটিশ ধাচে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠন করা হয়। ১৮১৩ সালে টাউন চৌকিদারী ব্যবস্থা চালু করা হয়।

১৮৫০ সালে ভারতের সকল শহরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাশ করা হয়। ১৮৫৪ ও ১৮৬৮ সালে উক্ত আইনের কিছু সংশোধন করা হয়। ১৮৬৪ সালে পৌরসভা উৎকর্ষ আইনের দ্বারা বড় বড় শহরে পৌরসভা গঠন ও পৌর কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৬৮ সালের

জেলা শহর আইন দ্বারা ছোট ছোট শহরেও পৌরসভা স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭২ সালের পূর্ব পর্যন্ত পৌর কমিটিতে নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৫৭ সালে পৌরসভা সংক্রান্ত সকল আইনকে সমন্বিত করা হয়। ১৮৮৪ সালে লর্ড রিপনের সময়ে বঙ্গীয় পৌরসভা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ দেশে প্রতিনিধিত্বশীল পৌরসভা স্থাপিত হয়। তখন পৌরসভা গঠিত হতো নয় জন থেকে ত্রিশ জন সদস্য নিয়ে। দুই তৃতীয়াংশ সদস্য করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়ার্ড ভিত্তিক সদস্যগণ কর্তৃক চেয়ারম্যান নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৪ সালে পৌরসভাকে আরো কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং বৃটিশ রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল ছিল।

পাকিস্তান পর্যায়ঃ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও বৃটিশ আমলের প্রণীত বিধান অনুসারে দেশের সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার পরিচালিত হতে থাকে। ১৯১৯ সালের পর স্থানীয় সরকার কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে অনেক পরে ১৯৪৬ সালে। এ সময় ইউনিয়ন বোর্ড মনোনয়নের প্রথা বাতিল করা হয়। অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ডের সকল সদস্যকে নির্বাচিত হতে হতো। কিন্তু এ অবস্থা বেশ দিন টেকেনি। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান সরকার এ সম্পর্কে নতুন আইন পাস করেন। জেলা বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের অনুরূপভাবে ১৯৫৭ সালের মে মাসে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় ২২ নং আইন দ্বারা ১৯৩২ সালের পৌরসভা আইনের সংস্কার ও সংশোধন করা হয়। এই আইনের দ্বারা পৌরসভার মনোনয়ন দান ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। সংশোধনী অনুসারে পৌরসভার সকল কমিশনার ২১ বৎসর বয়স্ক সুস্থ নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন।

১৯৫৮ সালের গোড়া দিকে পাকিস্তানে সংসদীয় ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে এক দারুন স্থিতিহীনতা দেখা দেয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা এ সুযোগে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলোকে বাতিল বলে ঘোষণা করেন। সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেন, সংবিধানকে বাতিল করে দেন এবং জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এক অধ্যাদেশ বলে (প্রেসিডেন্ট আদেশ নং) সমগ্র দেশে নতুন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। উক্ত শাসন ব্যবস্থার নাম মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতি।

will be formed will be free from the curse of party intrigues, political pressures and tub thumping politicians that characterized the assemblies in our country in the best(Jahan-opcit;11)।

জনগণকে রাজনীতি সচেতন এবং রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্য এই পদ্ধতি চালু করা হয়। বিশেষ করে গ্রামীন জনগণ যেমন রাজনৈতিকভাবে সচেতন নয় তেমনি নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তারা বেশ অজ্ঞ। জনগণের এই অজ্ঞতাই মূলতঃ মৌলিক গণতন্ত্রের ভীত রচনায় সহায়তা করেছে।

"The Basic Democracies system was designed to accomplish multiple political activities. It was expected to mobilize the mass of the people especially in rural areas, for development activities, and to give them a sense of active participation in local affairs" (Ibid;111)। মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতিতে গ্রাম ও শহর উভয় এলাকাকেই অন্তর্ভূক্ত করা হয়। গ্রাম এলাকার জন্য ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল ও শহর এলাকায় ইউনিয়ন ও টাউন কমিটি। ইউনিয়ন কাউন্সিল ইউনিয়ন কমিটি ও শহর কমিটির সদস্যগণ প্রথমে নির্বাচনী সংস্থার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন কাউন্সিল, ইউনিয়ন কমিটি ও টাউন কমিটির সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন সদস্যরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করিতেন। মৌলিক

সারণী ৩.২ ঃ Structure of the Basic Democracies

participatory institutions	Chairman	Members
Divisional council	Commissioner (Government official)	Helf elected half officials
District council	Deputy commissioner (official)	Half elected half officials
Thana council or municipal committee	Sub divisional officer (official)	Half union council chairman, half officials
Union councilor union committee	Elected by Members	Elected by Universal adult franchise.

sources: Rounaq Jahan, Pakistan: Failure in national integration, (Dhaka: University Press Ltd. 1977)

গণতন্ত্র আদেশের দ্বারা চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, যথা (১) ইউনিয়ন কাউন্সিল (২) থানা কাউন্সিল (৩) জেলা কাউন্সিল ও (৪) বিভাগীয় কাউন্সিল। পূর্বের ইউনিয়ন বোর্ড মৌলিক গণতন্ত্রে ইউনিয়ন কাউন্সিল নামে পরিচিত হয়। ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র চালু করার পূর্বে পাকিস্তানে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল (Pakistan Gazette,1959)। আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র চালু করায় ইউনিয়ন বোর্ড বিলুপ্ত হয়ে পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে "ইউনিয়ন কাউন্সিল" ব্যবস্থা চালু করা হয় (Mellema,1961:10-15)। এই মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুসারে ইউনিয়ন ও জেলা প্রশাসনের মাঝখানে থানা তহসীল কাউন্সিল গঠন করা হয়।

ইউনিয়ন কাউন্সিল ছিল গ্রাম পর্যায়ের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মৌলিক স্তর। প্রতি কাউন্সিলে গড়ে ১০ থেকে ১৫ টি নির্বাচনী একক ছিল। গড়ে প্রতি এককে ১,০০০ থেকে ১,৫০০ শত লোক বসবাস করতেন। প্রতি ইউনিয়নের জন সংখ্যা ছিল ১০,০০০ হাজার থেকে ১৫,০০০ হাজারের মধ্যে। যেহেতু প্রতি ইউনিয়নের দশ থেকে পনেরটি নির্বাচনী একক ছিল সেহেতু ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য সংখ্যা ছিল দশ জন থেকে পনের জন। সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত এবং এক তৃতীয়াংশ মনোনীত হতেন। জেলা প্রশাসকের সম্মতিক্রমে মহকুমা প্রশাসন সদস্যদের মনোনয়ন দান করতেন (Rahman,1990:56)। মনোনয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য হবার বিধানটি ১৯৬৪ সালে বিলুপ্ত করা হয়।

ইউনিয়ন কাউন্সিল একটি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হলেও এর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রবল। সরকারী কর্মকর্তাগণ বিভিন্নভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারতেন। কোন কাউন্সিলের সদস্যগণ সময়মত তাদের চেয়ারম্যান নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে, সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে মহকুমা প্রশাসক যে কোন একজন সদস্যকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করতে পারতেন।তাদের শুধু নির্বাচন নয়। বিভিন্ন কারণে বরখাস্ত করার ক্ষমতা ও সরকারের ছিল। সরকার প্রয়োজনবশতঃ কোন কাউন্সিল বাতিল করতে এবং ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারতেন। কাউন্সিলের যাবতীয় কিছু তদারক করার ক্ষমতা সরকারী কর্মকর্তাদের উপর প্রদান করা হত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রবল। বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা কাউন্সিলের ছিল কিন্তু চূড়ান্তভাবে অনুমোদন সংশোধন ও পরিবর্তনের ক্ষমতা অর্পিত ছিল মহকুমা প্রশাসকের উপর। স্থানীয় কর ধার্যের ক্ষেত্রে সরকারী অনুমোদন প্রয়োজন ছিল।

থানা পর্যায়ে থানা কাউন্সিল গঠিত হতো। ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ বলে থানা পর্যায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য থানা কাউন্সিল গঠন করা হয়। থানা কাউন্সিল গঠিত হতো থানা এলাকার ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের নিয়ে। সরকারী কর্মকর্তারা মনোনীত থাকতেন। থানা কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল সমূহের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা। ইউনিয়ন কাউন্সিলের উন্নয়ন পরিকল্পনা থানা কাউন্সিলের মাধ্যমে পরিচালিত হত এবং কার্যাবলীব জন্য জেলা কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকত। থানা কাউন্সিলের নিজস্ব কোন কর্মচারী ছিল না। একজন সরকারী সদস্য সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করতেন। থানা কাউন্সিলের কর বা রেট ধার্যের কোন ক্ষমতা ছিল না। সরকারী অনুদানের মাধ্যমে এর যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদিত হত। রুটিন মাফিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার যে পরিমান অর্থ প্রদান করতেন সে অনুসারেই ব্যয় করা হত মাত্র (রহমান, ১৯৮৮:৯৬)। থানা কাউন্সিলের প্রধান কাজ ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল বা টাউন কমিটির কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করা। কার্যবলীর প্রতি নজর করলে একে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার না বলে একটি সমন্বয় সাধনকারী কমিটি বলা যেতে পারে।

মৌলিক গণতান্ত্রিক আদেশবলে জেলা পর্যায়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জেলা কাউন্সিল গঠন করা হয়। পূর্বে এর নাম ছিল জেলা বোর্ড। কাউন্সিলেব নির্বাচিত সদস্য এবং সরকারী সদস্যের সংখ্যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। তবে সরকারী সদস্যের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার চেয়ে অধিক হত না। কোন কোন অফিসার পদাধিকার বলে সরকারী সদস্য হবেন তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হত। জেলার আওতায় ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের ভোটে জেলা কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হতেন। তবে এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ছিল ব্যতিক্রম। সেখানে জেলা কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যানদের পরিবর্তে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে জেলা কাউন্সিলের সদস্য এবং এর চেয়ারম্যান ছিলেন। চেয়ারম্যান সভায় সভাপতিত্ব করতেন। কাউন্সিলের প্রশাসনিক ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত ছিল তিনি কাউন্সিলের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতেন এবং দৈনন্দিন কাজের হিসাব রাখতেন। জেলা কাউন্সিলের যে কোন কর্মচারীকে তিনি যে কোন সময় নিয়োগ,বদলী ও অপসারণ করতে পারতেন (রহমান,১৯৮৮:৯৭-১০৭)। কর নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যবস্থা করা, কাউন্সিলের পক্ষ থেকে সরকারের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ রক্ষা করা,

নোটিশ জারী এবং সময় সময় বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পাদন করা ছিল তার দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত।

জেলা কাউন্সিলের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রবল। সরকার বিভিন্ন ভাবে জেলা কাউন্সিলের উপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে পারতেন। যেমন বিভাগীয় কমিশনার ছিলেন এর নিয়ন্ত্রক এবং জেলা প্রশাসক চেয়ারম্যান অর্ধেক সদস্য ছিলেন সরকারী- যাদের সরকারী অফিসারদের মধ্যে থেকে মনোনয়ন দেওয়া হত। নির্বাচন ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হত সরকারী সিদ্ধান্ত ও বিধান অনুসারে। জেলা কাউন্সিল নিজ ইচ্ছা অনুসারে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারত না। সব ক্ষেত্রে জেলা কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণ হিসেবে বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদন প্রয়োজন ছিল (রহমান ১৯৮৮ঃ ১০৩-১০৪)। তিনি কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত যে কোন পরিকল্পনা বাতিল, স্থগিত, বা আংশিক পরিবর্তন করতে পারতেন।

তিনি কাউন্সিলের কার্যাবলী সম্পাদন বাধা এবং কোন কাজ করতে বাধ্যও করতে পারতেন। প্রয়োজনবশতঃ তিনি কাউন্সিলের কার্যাবলী তদারক করার জন্য লোক নিয়োগ করতে পারতেন। কার্যাবলী সম্পাদনে ব্যর্থ, অর্থ আত্মসাৎ বা অন্যবিধ কারণের জন্য সরকার উক্ত কাউন্সিলকে নির্দিষ্ট কালের জন্য বাতিল করতে পারতেন। বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাগণ প্রধান ক্ষমতার অধিকারী। বিভাগীয় কমিশনার বাজেট অনুমোদন, প্রয়োজনবশতঃ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করতে পারতেন। জেলা কাউন্সিলের হিসাব সরকারীভাবে নিরীক্ষণ করা হত।

তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানে ১৭টি জেলা এবং ১৭টি জেলা কাউন্সিলের নির্বাচকদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০৭০ জন। ইউনিয়ন কাউন্সিল ও টাউন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন কাউন্সিলের ভোটার। এখানে সাধারণ মানুষের কোন ভোটাধিকার ছিল না। এটা ছিল একটা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (রহমান,১৯৮৮ঃ১০৪)। চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক ও অর্ধেক সদস্য ছিলেন সরকারী অফিসার। তাই স্বল্প সংখ্যক প্রতিনিধি সদস্যবৃন্দ এইসব প্রভাবশালী সরকারী অফিসারদের সামনে জোর দিয়ে কথা বলতে পারতেন না। এখানে সরকারী আমলাদের প্রভাবই ছিল অধিক। জেলা কাউন্সিলে জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা বিভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার করতো। নিজস্ব ও তহবিল গঠনের জন্য করারোপ এবং ক্ষমতা অর্পণ করা হলেও তা বিভিন্নভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায় রাখা হয়।

১৮২৯ সালে প্রশাসনের স্তর হিসেবে বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি বিভাগ গঠিত হয়। ভূমি রাজস্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থার সুগঠনের জন্য বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ অনুসারে বিভাগীয় কাউন্সিল নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। উহা শুধু সরকারী ও বেসরকারী সদস্য নিয়ে গঠিত হত এবং সকল সদস্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান প্রবর্তনের পর বিভাগীয় কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। বিভাগীয় কাউন্সিলের সুনির্দিস্ট তেমন কোন কাজ ছিল না। তাই সমন্বয় সাধন করাই ছিল এর প্রধান কাজ। বিভাগীয় কাউন্সিলের কোন নিজস্ব কর্মাচারী ছিল না (রহমান,১৯৮৮ঃ১০৫)। বিভাগীয় কমিশনার সবকিছু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কমিশনারকে সহযোগিতা করতেন সরকারী কমিশনার। বিভাগীয় কাউন্সিলের কোন সঠিক কার্যাবলী না থাকার জন্য এর নিজস্ব তহবিল এবং নির্ধারণেরও কোন ক্ষমতা ছিল না। বিভিন্ন জেলা কাউন্সিল ও স্থানীয় সংস্থাকে অর্থ মঞ্জুরী দানের জন্য সরকার বিভাগীয় কাউন্সিলের হাতে অর্থ প্রদান করতেন মাত্র।

১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তমশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যম গঠন করার কথা বললেও আসলে উদ্দেশ্য ছিল অন্য রকম। সকাল স্তরেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ ছিল খুব প্রবল এবং একজন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ছিলেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের জন্য মহকুমা প্রশাসক। থানা কাউন্সিলের জন্য জেলা প্রশাসক। জেলা কাউন্সিলসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। এই নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষগণ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্নভাবে কাউন্সিলসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারতেন।

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার আর একটি সমালোচনা হল, তথাকথিত মৌলিক গণতান্ত্রীগণ শুধু ইউনিয়ন কাউন্সিল, টাউন কমিটি বা ইউনিয়ন কমিটির সদস্য ছিলেন না। তারা নির্বাচক মন্ডলীর সদস্য হিসেবে দেশের প্রেসিডেন্ট। জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন করার পর স্থানীয় কাউন্সিলের সদস্যে রূপান্তরিত হতেন। এটি ছিল স্থানীয় শাসন নীতির মারাত্মক লংঘন। এমনিভাবে তারা জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন, ফলে স্থানীয় শাসনের বিকাশ ও দক্ষতা ব্যাহত হয়। মৌলিক গণতন্ত্র আমলের স্থানীয় সরকারের প্রকৃত কার্যাবলী সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দই পরিচালনা করতেন (রহমান,১৯৮৮:১০৯)। এই প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরা নীতি নির্ধারনে ভূমিকা রাখতে পারতেন না বলে কাজের প্রতি অনিহা দেখাতে থাকে।

অপরদিকে সরকারী অনুদানের প্রতি আগ্রহ দেখাতে তাকে (Ahmed,1978:52-67)। ফলে চেয়ারম্যান ও প্রশাসনের মধ্যে গোপনে অবৈধ অর্থনৈতিক লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে।

মৌলিক গণতন্ত্র নগর কেন্দ্রীক স্থানীয় সরকার কাঠামো ছিল নিম্নরূপঃ (১) মিউনিসিপ্যাস কমিটি / টাউন কমিটি (২) ইউনিয়ন কমিটি (৩) ওয়ার্ড কমিটি। বড় শহরে মিউনিসিপ্যাল কমিটি ও ছোট শহরে টাউন কমিটি গঠিত হতো। শহরের নির্বাচনী এককগুলোকে ওয়ার্ডে বিভক্ত করে ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হয়। কয়েকটি ওয়ার্ড নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বহাল থাকে। মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশে অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু করা হয় এবং বৃহত্তর জনসাধারনের ভোটাধিকার হরণ করা হয়। একই সাথে এই ব্যবস্থা দ্বারা পুরো স্থানীয় সরকার কাঠামোকে দুর্নীতিগ্রস্থ করা হয়।

বাংলাদেশ পর্যায়ঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের ৭ নং আদেশ দ্বারা মৌলিক গণতন্ত্র রদ করা হয়। স্থানীয় কাউন্সিল ভেঙ্গে দেওয়ার পেছনে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, ঐ সব পাকিস্তান আমলের সৃষ্টি এবং স্বাধীনতার পেক্ষাপটে পূর্বের পরিষদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেনা। সে বছরই রাষ্ট্রপতি ২২ নং আদেশ দ্বারা ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গুলি রিলিফ কমিটির স্থলাভিষিক্ত হয় (Rahman, 1990:45)। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পঞ্চায়েতের সুষ্টুভাবে পরিচালনার জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন সদস্য মনোনীত হতেন। মহকুমা প্রশাসক তাদের নিয়োগ দান করতেন (Amendment order, 1972)। রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে এটাও বলা হয়েছিলো যে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রণীত হবার পূর্ব পর্যন্ত ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু থাকবে। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার বিষয়ে বিস্তারিত আইন পাশ করে (The Bangladesh Gazeette 1973)। উক্ত আইন বলে ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়। ধারা মতে ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডের বিভক্ত এবং প্রতি ওয়ার্ডে জন্য তিনজন সদস্য ছিলেন। পরিষদের একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। আইনের বিধান অনুসারে এদের সবাই প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। ১৯৭৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পর দেখা যায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজনের সুস্পষ্ট বিধান না থাকায় অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম দেয়।

১৯৭২ সালের ২৮ এপ্রিল থানা পর্যায়ে থানা উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রধান ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য। থানা উন্নয়ন কমিটি থানা কাউন্সিলের চেয়ে কোন অংশেই ভালো ছিলেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কোন লক্ষণই থানা উন্নয়ন কমিটির মধ্যে ছিল না। জেলা কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে জেলা বোর্ড রাখা হলেও বোর্ডে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কতিপয় বিপথগামী সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নিহত হন। তারপর খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতায় বসেন এবং মোশতাক আহমদের পরে মেজর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের বৈধতা করণে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন। জিয়া সামরিক সরকারের শাসনামলে ১৯৭৬ সালে ২০ নভেম্বর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ জারী করা হয়। অধ্যাদেশ অনুসারে গ্রাম স্বায়ত্তশাসনের স্তর হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শহর এলাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় পৌরসভা। অধ্যাদেশ অনুসারে ১৯৭৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদে ভাইস-চেয়ারম্যান পদের বিলোপ সাধন, প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে দুজন মহিলা সদস্যা মনোনয়নের ব্যবস্থা গৃহীত এবং সে অনুসারে প্রতি ইউনিয়ন পরিষদে দুজন মহিলাকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। মহকুমা প্রশাসক তাদের মনোনয়ন দিতেন।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে প্রথম স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারি করা হয় ১৯৭৬ সালে। এই অধ্যাদেশে তিন স্তর বিশিষ্ট্য স্থানীয় সরকার প্রবর্তন করা হয়। এগুলো হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। ১৯৭৬ সালে প্রণীত স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ মোতাবেক জেলা পরিষদ গঠনের কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। ১৯৮০ সালে জেলা প্রশাসনকে প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নেয়া হয়। সরকার প্রতি জেলায় একজন সংসদ সদস্যকে জেলা সমন্বয়কারী হিসেবে নিয়োগ দেয়। তাদের উপমন্ত্রীর পদমর্যাদা দেয়া হয়। বিশেষত জেলার আওতায় উন্নয়নকর কার্যাদির সমন্বয় সাধনের জন্য তাদের নিযুক্ত করা হয়। এটা ছিল কতিপয় দলীয় নেতাদের খুশি করার কৌশল মাত্র। ১৯৮০ সালের ৩০ এপ্রিল ইউনিয়ন পরিষদের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় উন্নয়নের জন্য গ্রাম সরকাব প্রকল্প গ্রহন করে (The Bangladesh Gazette, 1980)। গ্রাম সরকারের দায়িত্বসমূহকে মোট ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতি বিভাগের দায়িত্ব একজন সদস্যকে দেওয়া হয় এবং তাকে সহযোগিতা করার জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের কথা বলা হয়। গ্রাম সরকারের কাজ সঠিক ভাবে করার জন্য কতগুলো কমিটি গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে এবং দুটির অধিক কমিটিতে কোন সদস্যকে না রাখার বিধান করা হয় (বিধিমালা, ১৯৮০)।

জিয়া সরকারের সময় গঠিত গ্রাম সরকার ব্যবস্থা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারকে রাজনৈতিক উন্নয়নের সাথে যুক্ত করা হলেও বাস্তবে তা ছিল রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের পন্থা মাত্র। গ্রাম সরকার গঠন করতে গিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের বিপরীতে দ্বৈত শাসনের এক জরাসন্ধ সৃষ্টি করেন। ফলে গ্রাম সরকার গঠনের মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে পারেনি।

রেখাচিত্র ৩.১ ঃ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার কাঠামো

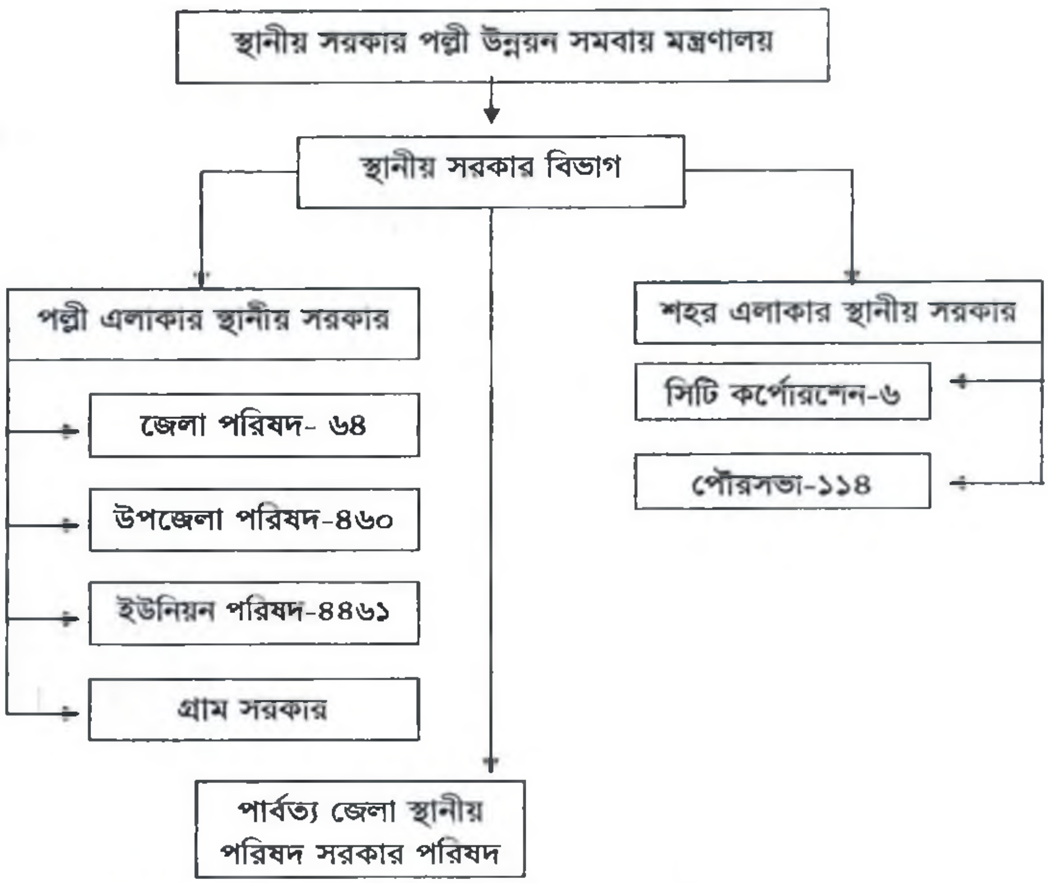

সূত্র ঃ রফিকুল ইসলাম, নারীর রাজনীতি এবং স্থানীয় সরকার, রূপান্তর, ২০০২, খুলনা।

গ্রাম সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ তথা গ্রাম প্রধান ও ওয়ার্ড মেম্বারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে কোন বিভাজন রেখা না থাকায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়। তাছাড়া নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় গ্রাম সরকার ক্ষমাসীন দলের সম্প্রারিত বাহুতে পরিণত হওয়ায় ইহা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। ফলে, পরবর্তী সরকার ক্ষমতাসীন

হয়েই ১৯৮২ সনে স্বনির্ভর গ্রাম সরকারের বিলুপ্ত ঘটায়। পরিষেখে বলা যায়, জিয়াউর রহমানের শাসনকালে গ্রাম সরকার গঠন এবং জেলা সমন্বয়কারী নিয়োগসহ যত প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন স্থানীয় পরিষদগুলোর উপর আনয়ন করা হয় তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মুক্ত ছিল না।

১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন পুর্নগঠন আইন এদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোর এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই আইনের দ্বারা গ্রামীন থানাগুলোকে উপজেলা নামকরণ করা হয় এবং প্রতিটি উপজেলায় গঠন করা হয় একটি উপজেলা পরিষদ। শুধু উপজেলা পরিষদ নয়, ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ এরশাদ সরকার পাঁচ থেকে তিন বছরে নামিয়ে আনেন। উদ্দেশ্য ছিল আগাম নির্বাচন দিয়ে গ্রাম-গঞ্জের লোকদের মাতিয়ে রাখা, যেন তার বিরুদ্ধে গণআন্দোলন দানা বাঁধতে না পারে। এরশাদ সরকারের সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান দলীয় প্রভাব থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি।

উপজেলা পরিষদ ভিন্ন অন্যকিছু গঠন ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উপজেলা পরিষদ কিছুটা স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়। এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, উপজেলা পরিষদ সৃষ্টি ছিলো একটি গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। ইতিপূর্বে থানা পর্যায় যে পরিষদ ছিল সেটি স্থানীয় প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন ছিল না। তদুপরি থানা পরিষদে আমলাতন্ত্রের প্রভাব ছিল প্রবল। সে তুলনায় উপজেলা পরিষদ একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তবে উপজেলা পরিষদেরও নানা সমস্যা ছিল। ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের মধ্যে প্রায়ই কোন্দল দেখা যেত। উভয় পরিষদের চেয়ারম্যান দ্বয় নিজেদের অনুকূলে অধিক বরাদ্দের জন্য প্রভাব খাটাতেন (Ahmed,1985:69-74)। উপজেলা পরিষদ অধ্যাদেশ অনুসারে সকল প্রকার ক্ষমতা নির্বাচিত চেয়ারম্যান উপর ন্যাস্ত করা হয়। এছাড়া ইউ.এন.ও র প্রভাব খর্ব হয়, ফলে নির্বাহী অফিসার চেয়ারম্যানকে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি। অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাতে পারেনি তা তাদের থেকে বোঝা যায়। এসব কারণেই উপজেলা পরিষদকে ঘিরে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। উপজেলা পরিষদে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণের পাশাপাশি উপজেলায় কর্মরত কর্মকর্তাগণ ছাড়া সরকার মনোনীত চারজন সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। আসলে এতজন জনপ্রতিনিধি থাকার পরও আবার মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখা জনগণের স্বার্থরক্ষার চেয়ে এবং সরকারী স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা বৈ আর কিছুই নয়। বলা বাহুল্য যে, এই ধরনের বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থা, উপজেলা ব্যবস্থার মৌলনীতির পরিপন্থী (হাসান, ২০০০ঃ৬৪)। উপজেলা পরিষদের উপর জেলা প্রশাসকের প্রভূত

ক্ষমতা প্রদানের ফলে উপজেলার স্বাধীনতা অনেকাংশ ক্ষুণ্ন হয়েছে। নিয়মানুযায়ী উপজেলা পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ সভার কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের ১৪ দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক সমীপে পেশ করা বাধ্যতামূলক (ordinance no lix of 1982,Article 28)। ইহা ছাড়া উপজেলায় কর্মরত সকল সরকারী কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, চাকরির শর্তাবলী, বদলি ও প্রশিক্ষণ সব কিছুই নির্ধারিত হতো সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে। সুতরাং দেখা যায় উপজেলার কর্মরত অধিকাংশ কর্মকর্তাই প্রত্যক্ষভাবে সরকারের উপর নির্ভরশীল। এইভাবে উপজেলা পরিষদকে সম্পূর্ণরূপে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের ৬ তারিখে রাষ্ট্রপতি এইচ এম এরশাদ পদত্যাগ করলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এরশাদ সরকার আমলে পাসকৃত পল্লী পরিষদ আইনের কার্যকারিতা। স্থগিত এবং জেলা পরিষদ সম্পূর্ণ বাতিল করে (রেহমান,২০০০ঃ১৬০-১৬৬)। পরবর্তীতে ক্ষমতায় গিয়ে বি.এন.পি সরকার উপজেলা পরিষদ বাতিল ঘোষণা করেন।

স্থানীয় সরকার- সর্বশেষ পদক্ষেপঃ ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর বর্তমান সরকার একজন মন্ত্রীকে প্রধান করে লোকাল গর্ভনমেন্ট স্ট্রাকচার রিভিউ কমিশন (Local Government structure Revew commission) নামে উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিশনকে দায়িত্ব দেয় একটি স্থানীয় সরকার কাঠামো সুপারিশ করার জন্য। কমিশনের সুপারিশক্রমে সরকার উপজেলাকে থানায় পরিবর্তিত করে একজন থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জিলা পরিষদ ব্যবস্থা চালু করা হয়। এছাড়া কমিশনের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালের ১৩ জুলাই ইউনিয়ন পরিষদ বিল (The Union Parshad Ameendment Bill 1993) পাশ হয়। এই বিলে ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন সদস্য এবং সমগ্র ইউনিয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যানের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া ইউনিয়নের সামগ্রীক উন্নয়ন ও বাস্ত বায়ন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ যোগানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আওয়ামীলীগ পাঁচ বছরের শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে চার স্তরের কাঠামো দিয়ে আইন প্রণয়ন করে গেছে। শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদের সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্যের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো আইন তারা বাস্তবায়ন করে যেতে পারেনি।

১৯৯৭ সালে ওয়ার্ড পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ সর্বনিম্ন পর্যায়ে গঠিত হয়। গ্রাম পরিষদকে ১৪ ধরনের কাজ দেয়া হয়। গ্রাম পরিষদকে সরকার প্রয়োজনতো অনুদান দেবে এই নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিক পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধনী আইন ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ৩৮টি নাগরিক কর্মদায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। এসব আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদকে অনেকগুলি কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সীমিত। ১৩ সদস্যের ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত তিন মহিলা সদস্যের প্রতিনিধিত্বশীলতার মধ্যে দিয়ে কিছুটা নারী পুরুষ ভারসাম্য সৃষ্টির প্রয়াস বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংস্কার এক লক্ষণীয় সাফল্য।

পরিশেষে বলা যায় বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে যাচ্ছে এবং এদের উপর ব্যাপক কাজের দায়িত্বও পড়েছে। তবে আর্থিক সমস্যা এদের একটি প্রধান সমস্যা, জনকল্যাণের জন্য বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উক্ত কাঠামোকে আরও পূনঃবিন্যাস করার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক ইউনিট। বর্তমান উপজেলা প্রশাসন স্থানীয় ও জাতীয় সরকারের একটি সমন্বিত কাঠামো। জেলা পর্যায়েও এমন একটি কাঠামো দাড় করানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত দেশে রাজনৈতিক সরকার জন্ম না নিবে ততদিন স্থানীয় সরকারের ভূমিকা তত গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। তাই সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরীর কাজ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই শুরু করতে হবে। তবেই স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশে তার যথাযথ ভূমিকা রাখতে সম্ভব হবে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ
তথ্য বিশ্লেষণ ও সমথয়করণ

ভূমিকা ঃ দেশের সবচেয়ে প্রাচীন এবং শিকড় পর্যায়ের স্থানীয় সরকার হচ্ছে ইউনিয়ন কমিটি। বেশ কয়েকবার নাম পরিবর্তনের পর বর্তমান নামকরণ হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ। তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে প্রবেশের প্রথম সোপান হলো ইউনিয়ন পরিষদ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একাধিক আইন। অধ্যাদেশ প্রবর্তন এবং সংশোধন করা হয়েছে। এদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম তেমন পরিবর্তন হয়নি। সদস্য/সদস্যাদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি; তারা নির্বাচিত না মনোনীত হবেন এই বিষয় এবং আয়ের উৎস সম্পর্কে বিধান রাখা ছাড়া প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়নি।

সংবিধানের আলোকে গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত সকল সরকারী সংস্থাকে ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত করে এদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জনগণের ক্ষমতা জনগণ ব্যবহার করে নিজেদের কল্যাণে শাসন কাজ পরিচালিত করার যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার তার বাস্তায়নের এই পদক্ষেপ অপরিহার্য।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল শুরু হয় প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে। বাংলাদেশে সর্বমোট ৪,৫০২টি ইউনিয়নে পরিষদ রয়েছে। ২৫ বছর বয়স্ক যে কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে তাকে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা ও ভোটার হতে হবে। এবং নির্বাচন আইনের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে হবে। নির্বাচনের পর চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ গ্রহণ করতে হয়। চেয়ারম্যান পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। পরিষদের নির্বাহী কর্তৃত্ব তার উপর ন্যস্ত।

ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী ঃ ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের প্রাচীনতম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত ও পরিচালিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীকে দুভাগে ভাগ করা যায়- মৌল ও উন্নয়নমূলক। মৌল কাজগুলো নিম্নরূপ-

১। গ্রামাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২। অপরাধমূলক কার্যকলাপ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, চোরাচালান বন্ধের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৩। ইউনিয়নে কর্মরত রাজস্ব কর্মকর্তাদের কর আদায়ে সাহায্য দান।

৪। রাস্তা বা সরকারী সম্পত্তি কেউ অবৈধভাবে দখল করলে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষকে জানানো।

৫। সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে থাকে পরিষদ সরকারের এই সব নীতি বা কর্মসূচী জনসাধারণের নিকট প্রচার করা।

৬। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের চাকরীর কার্যকাল ও শর্তাবলী নির্ধারণ।

৭। সরকারী কর্মকর্তাদের তাদের দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান।

৮। পরিষদে কোন অপরাধ সংঘটিত হলে পুলিশকে জানানো এবং অপরাধ দমনে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

৯। সরকার বা অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে প্রচারমূলক কাজে সাহায্য করা।

১০। কৃষি, বন, মৎস্য, গবাদি পশু, শিক্ষা, কুটির শিল্প, যোগাযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিকল্পে যা যা প্রয়োজন তা করা।

১১। সালিশী আদালত হিসেবে কাজ করে ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করা।

উন্নয়নমূলক কাজ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের মধ্যে নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। এর মধ্যে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সড়ক উন্নয়ন ইত্যাদি কার্য অন্যতম। নিম্নে এই সকল কার্য উল্লেখ করা হলোঃ

ক) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও তত্ত্বাবধান এবং আলোর ব্যবস্থা করা।

খ) রাস্তাঘাটের পাশে বৃক্ষরোপন এবং উহাদের সংরক্ষণ করা।

গ) গোরস্থান, শ্মশান প্রভৃতি সাধারণ স্থানের তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ।

ঘ) সরকারী সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।

ঙ) জনসাধারণের জন্য পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং এই উদ্দেশ্য কূপ, নলকূপ, পুকুর ও দীঘি খনন এবং সংরক্ষণ।

চ) খেলাধুলার মাঠ নির্মাণ, মেরামত, পার্ক তৈরী ও তত্ত্বাবধান।

ছ) ইউনিয়ন এলাকায় পাঠাগার স্থাপন করা।

জ) জন্ম, মৃত্যু রেজিষ্ট্রিকরণ ও গবাদিপশুর বিক্রয় রেজিষ্ট্রিকরণ।

ঝ) স্বাস্থ্য নষ্টকারী ও নৈতিকতা বিনষ্টকারী কোনো পেশা রহিতকরণ।

ঞ) বাসস্থানের নিকটবর্তী স্থানে চামড়ার ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বা ইটের পাঁজা বা মাটির কারখানা নিয়ন্ত্রণ।

ট) বন্যা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্য ও সেবার ব্যবস্থা করা।

ঠ) এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, পথে-ঘাটে রাস্তায় ক্ষতিকর বা উপদ্রবমূলক অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা।

ড) কৃষি উন্নয়নের জন্য বার্ষিক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ও কৃষির সর্বাত্মক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা।

ঢ) ইউনিয়নে মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ। জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান খেলাধুলা প্রমুখ কাজে উৎসাহ দান।

ন) এলাকায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জনগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা কেন্দ্রে জন্ম নিরোধ ব্যবস্থার প্রচারণা।

ত) ইউনিয়নে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যে প্রদান, পাঠাগার ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, বয়স্ক ও নিরক্ষরদের জন্য পাঠশালা স্থাপন।

প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ উপোরক্ত কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে। স্থায়ী কমিটি ছাড়াও জনগুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অতিরিক্ত কমিটি গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে বিধিমালা অনুযায়ী সরকার যে কোন সময় ইউনিয়ন পরিষদকে যে কোন দায়িত্ব প্রদান করতে পারে। আবার যে কোন দায়িত্ব প্রত্যাহার করে সরকার গ্রহণ করতে পারে।

ইউনিয়নে পরিষদের আয়ের উৎস ঃ ইউনিয়ন পরিষদের একাধিক আয়ের উৎস রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ধার্যকৃত করই ইহার মূল আয়ের উৎস। সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ইউনিয়ন পরিষদ কর ধার্য করে থাকে।

ক) জমিজমা ও ঘরবাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর।

খ) আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের উপর কর।

গ) পেশা, ব্যবসা এবং বৃত্তি এর উপর কর।

ঘ) সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আপ্যায়ন এর প্রমোদ কর।

ঙ) ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হাট-বাজার এবং ফেরী হতে ফি।

চ) বাজারের জন্য প্রদত্ত কর।

ছ) পশুর উপর কর।

জ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স অনুমোদন এবং পারমিটের জন্য কর।

ঝ) আলোক সজ্জার উপর ধার্যকৃত কর প্রভৃতি।

স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন মূল সংবিধান ও অধ্যাদেশ ১৯৯৩

মূল সংবিধান ঃ বাংলাদেশ সংবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে, স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কতগুলো সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ প্রতিশ্রুতি মূল সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমাদের সংবিধান স্থানীয় সরকার সম্পর্কে ৪টি অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ৯,১১,৫৯ ও ৬০) রয়েছে। যেগুলো হলোঃ

"৯। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।

"১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র। যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে। মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং

প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

"৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

(২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনসাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন। এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক একাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবে. (ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য (খ) জন শৃঙ্খলা রক্ষা (গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

"৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীতে পূর্ণ কার্যকর দাতাদের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।

অধ্যাদেশ ১৯৯৩ ঃ ১৯৯৩ সালের স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ সংশোধনী আইনের প্রধান ধারাসমূহ -

১। ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং তারা ইউনিয়ন পরিষদে সদস্যদের দ্বারা ভোটে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচিত হবেন।

২। সংশোধনী আইনের ৩০,৩১,৩২ ও ৩৩ ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীকে ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, নাগরিক কার্যাবলী, রাজস্ব ও প্রশাসন, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন।

৩। ১৯৯৩ সনের সংশোধনী আইনে ৭টি স্ট্যাডিং কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। যথা- (ক) অর্থ ও সংস্থাপন (খ) শিক্ষা (গ) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃপ্রনালী (ঘ) নিরীক্ষা ও হিসাব (ঙ) কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ (চ) সমাজ কল্যাণ ও কমিউনিটি সেন্টার (ছ) কুটির শিল্প ও সমবায়।

৪। অধ্যাদেশ আইনের ৪৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং ইউনিয়ন তহবিল নামে পরিচিত হবে।

৫। সংশোধনী আইনের ৪৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ইউনিয়ন তহবিলের সকল টাকা কড়ি কোন সরকারী ট্রেজারিতে অথবা সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন করে এরূপ ব্যাংকে অথবা সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন পন্থায় জমা রাখতে হবে।

৬। অধ্যাদেশ আইনের ৪৫ নং ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন তহবিলের অর্থ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে।

৭। সংশোধনী আইনের ৪৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি অর্থ বছর আরম্ভের পূর্বে নির্ধারিত পন্থায় উক্ত বছরের জন্য আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের বিবরণ প্রণয়ন করবে যা অতঃপর বাজেট নামে অভিহিত হবে এবং অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের নিকট পাঠাবে।

৮। অধ্যাদেশ আইনের ৪৮ নং ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পন্থায় ও পদ্ধতি অনুসারে সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে।

৯। আইনের ৪৯ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব নির্ধারিত পন্থায় নির্দিষ্ট বিরতিতে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিরীক্ষা করবেন।

১০। অধ্যাদেশ আইনের ৫১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার যেমন প্রয়োজন মনে করবেন সে অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ নির্ধারিত মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

১১। সংশোধনী আইনের ৫৭ নং ধারায় কর সংগ্রহ ও আদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। সকল কর, রেষ্ট ও ফি নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট নিয়মে সংগ্রহ করা হবে। তবে আইনে ইউনিয়ন পরিষদকে ৬টি বিষয়ের উপর কর, রেট, ফি ইত্যাদি আরোপ ও আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

আইনের কার্যকারীতা ও বাস্তবায়ন ঃ যদিও স্বশাসিত ও প্রশাসনিক কাঠামোর সাথে সমান্তরাল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়া আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। তবুও তা বাস্তবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক

কাঠামোয় আবদ্ধ। অতি ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তের জন্যও গ্রাম পর্যায়ের অফিসকে রাজধানী ঢাকার সচিবালয়ের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা যদি ১৯৮৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ আইন লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাবো সেখানে কিছু অসাংবিধানিক ধারা রয়েছে। ১৩ ও ৫৩ ধারা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আপসারণ ও পরিষদ বাতিলের ক্ষমতা সরকারী কর্মকর্তাদের রয়েছে। একই আইনের ৬০,৬১ ও ৬২ ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারী কর্তকর্তাদের তত্তাবধায়ন। নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা দেখা হয়েছে (মজুমদার, ২০০২ঃ৫)। এ ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ আইনে চেয়ারম্যান মেম্বারদেরকে জনসেবক হিসেবে গন্য করে তাদের উপর সরকারী কর্তকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ আরো পাকাপোক্ত করা হয়েছে। এসব কিছুই করা হয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, যা আমাদের দেশের জন্য সম্মানজনক নয়।

এছাড়াও বর্তমানে সরকার কর্তৃক গৃহীত অনেকগুলো পদক্ষেপ সংবিধান পরিপন্থী। পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদের বিশ একরের কম আয়তন বিশিষ্ট্য জনমহলের ইজারা দেওয়ার ক্ষমতা রদ করে যুব মন্ত্রণালয়ের হাতে দেওয়া হয়েছে। ফলে পরিষদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নষ্ট হয়েছে। অথচ ৬০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ ধরণের পদক্ষেপ সংবিধান পরিপন্থী।

তাছাড়া উপজেলা পরিষদ চালু করার মাধ্যমে "প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে" (সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১) আমাদের সংবিধানের এই ধারাটি বহু বছর ধরে উপেক্ষিত হয়ে আসছে। ১৯৮৫ সালে এরশাদ সরকারের আমলে উপজেলা পদ্ধতি চালু হলেও পরবর্তীতে এক অধ্যাদেশ বলে বাতিল ঘোষণা করা হয়। এই অধ্যাদেশ ছিল সংবিধানের ৭,১১,৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। অধ্যাদেশ দ্বারা স্থানীয় সরকারের কাঠামো বাতিল করা যায় না এমন কি সংসদে গৃহীত আইনের বলেও নয়। কারণ আমাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। তাছাড়া সংবিধানে স্পষ্ট বলা আছে মৌলিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন যোগ্য নয়। সুতরাং অধ্যাদেশের মাধ্যমে রহিত করা আদেশটি ছিল সংবিধানের পরিপন্থী। উপজেলা পরিষদ রহিত করা হলেও এর প্রশাসনিক কাঠামোকে বহাল রেখে নির্বাহী আদেশ চালু রাখা হয়। কার্যতঃ এখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার সাংবিধানিক অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়। অধ্যাদেশ বলে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বাতিল করা যায় না (রহমান, ১৯৮৮ঃ১৩৮)। সংবিধানে সর্বস্তরের প্রশাসনে

জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়। নতুন অধ্যাদেশে এসব কিছুই উপেক্ষা করা হয়।

১৯৯৮ সালে সরকার সারাদেশে আইন পাশ করে উপজেলা পদ্ধতি পুনর্বহালের ব্যবস্থা করে; কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং নির্বাচন কমিশনের অনীহার কারণে উপজেলা নির্বাচন সম্ভব হয় নি। উল্লেখ্য একটি রিট মামলার রায়ে হাইকোর্ট উপজেলা সহ সকল স্থানীয় সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। সে আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯২ সাল থেকে বি এন পি ও আওয়ামী লীগ সরকার অন্তত ১৭ বার উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আদালতের কাছ থেকে সময় বাড়িয়ে নিয়েছে। তারপরও নির্বাচন হয় নি (হোসেন, ২০০৩ ঃ ৭)।

জাতীয় সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করায় স্থানীয় প্রশাসনকে সংকুচিত করা হয়েছে। যা সম্পূরূপে সংবিধান পরিপন্থী। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শুধুমাত্র "আইন প্রণয়নের ক্ষমতা" সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানে স্থানীয় উন্নয়ন কাজে তাদের অংশগ্রহণের কোন বিধান রাখা হয়নি কিংবা অন্য কোনো ক্ষমতাও তাদেরকে দেওয়া হয়নি (মজুমদার, ২০০২ঃ৫)। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭(১) অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিদের শুধুমাত্র সংবিধানে প্রদত্ত ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছে। এর বাইরে কিছুই করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর করা হলে তা হবে সংবিধান পরিপন্থী।

স্থানীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ নির্বাহী বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। জাতীয় সংসদ বা আইন বিভাগের সদস্য হয়ে নির্বাহী বিভাগে জড়িত হওয়া "ক্ষমতা বিভাজন নীতির সম্পূর্ন" পরিপন্থী। এই বিবেচনায়ও সংসদ সদস্যগণ স্থানীয় প্রশাসনে নিজেদের জড়িত করতে পারে না।

সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছেন আইন প্রণয়ন ও বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির মাধ্যমে প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে। স্থানীয় উন্নয়ন কাজে সরাসরি অংশগ্রহণ করা তাদের কাজ নয়। স্থানীয় উন্নয়ন মূলত নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব।

ইউনিয়ন পরিষদ আইন, উপজেলা পরিষদ আইন ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আমলাদের কাছে আজ্ঞাবহ করা এবং এগুলোর উপর সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা কোনোভাবেই সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

নারীদের জন্য চ্যালেঞ্জ ঃ ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদে নারী প্রতিনিধিদের সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রবর্তিত নতুন আইনে নারীদের ৩টি (এক তৃতীয়াংশ) সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন বিধান করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে ২,১০,৩৩৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৫,০০০ নারী নির্বাচনে শুধু অংশগ্রহণেই করেননি তাদের মধ্যে ১৩,০০০ প্রার্থী নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে জয়লাভও করেছেন।

ক্ষমতা কাঠামোর এই জগতে পা দিতে গিয়ে নারী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। একটি সাধারণ আসনের একজন পুরুষ প্রার্থী যে সময়ে একটি ওয়ার্ডে যোগাযোগ করেছেন সেই একই সময়ে একটি সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীকে তিনটি ওয়ার্ডে ছোটাছুটি করতে হয়। তুলনামূলক ভাবে পুরুষের তুলনায় নারীকে সময় ও শ্রম বেশী দিতে হয়েছে। তাছাড়া নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত একটি ইউনিয়নের নয়টি সাধারণ আসন এবং একই সঙ্গে নয়টি ওয়ার্ডকে তিন ভাগ করে আবার তিনটি সংরক্ষিত নারী আসন। তাতে নারী আসনের ভোটার সংখ্যা সাধারণ আসনের তিন গুণ। কিন্তু সাধারণ আসন ও নারী আসনের জন্য সম্পদ বন্টন হয় সমহারে। একজন সদস্য সাধারণ আসনের কাজে যে সম্পদ ব্যয় করেন সমান পরিমাণ সম্পদ দিয়ে একজন নারীকে তিনগুণ ভোটারের জন্য কাজ করতে বলা হয় যা আসলে সম্ভব হয় না।

402466

কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী সদস্যরা তাদের কাজে সাফল্য অর্জণ করলেও তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অতিমাত্রায় পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব বিদ্যমান থাকায় নারীকে অনেক ক্ষেত্রে কোনঠাসা করে রাখা হয়েছে। চেয়ারম্যান পুরুষ সদস্যদের নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হওয়ায় নারী কর্মক্ষেত্রে কাজে অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে করতে

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

পারছে না। মহিলা সদস্যদের পুরুষ সদস্যদের মতই সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ করার কথা থাকলেও বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না।

সাধারণ আসনে নারী কিছু দৃষ্টান্ত ঃ ১৯৯৭ সালে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিরাট সাফল্য দেখা গেছে নারীদের (সংরক্ষিত ও সরাসরি নির্বাচন) অংশ গ্রহণের মাধ্যমে। ৮৫ শতাংশ নারী তাদের ভোটাধিকার সরাসরি প্রয়োগ করেন। এ নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামীন নারী রাজনীতিসহ সামাজিক ক্ষমতায়নে অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনও ছিলো বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসন ছাড়াও চেয়ারম্যান পদে ও সাধারণ আসনে অনেক নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে পুরুষের সঙ্গে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে। নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে ২৩২ জন নারী অংশ গ্রহণ করে এবং ২২ জন প্রার্থী বিজয়ী হন। চেয়ারম্যান পদে মহিলা প্রার্থীর শতকরা হার ১.০৯ ভাগ এবং বিজয়ী চেয়ারম্যানের শতকরা হার ০.৫২ ভাগ। অপরদিকে সাধারণ আসনে ৬১৭ জন নারী অংশগ্রহণ করে, প্রার্থীর শতকরা হার ০.৪৫ ভাগ এবং বিজয়ী হয় ৮৫ জন। বিজয়ী সদস্যের শতকরা হার ০.২২ ভাগ।

সারণী ৪.১৪ বিভাগ ভিত্তিক চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনে মহিলা (২০০৩)

ক্রমিক নং	বিভাগে নাম	চেয়ারম্যান পদে মহিলা		সাধারণ মেম্বার পদে মহিলা	
		প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা	বিজয়ী প্রার্থীর সংখ্যা
১	রাজশাহী	৫০	৪	৩৩৯	৫১
২	খুলনা	২৯	৩	৩৪	০
৩	বরিশাল	১৮	৬	৭০	১২
৪	ঢাকা	১০৩	৭	১৪৪	২১
৫	সিলেট	২	০	০	০
৬	চট্টগ্রাম	৩০	২	৩০	১
সর্বমোট		২৩২	২২	৬১৭	৮৫

উৎসঃ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জনসংযোগ বিভাগ

উপরের সারণীতে দেখা যায় দেশের ৬টি বিভাগে সংরক্ষিত আসন ছাড়াও ২৩২ জন নারী চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২২ জন জয়ী হয়। এছাড়া সাধারণ মেম্বার পদে ৬১৭ জনের মধ্যে ৮৫ জন নির্বাচিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৯৭ সালের ইউনিয়ন

পরিষদ নির্বাচনে যে পরিমাণ মহিলা চেয়ারম্যান ও সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছিলো ২০০৩ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দ্বিগুণ প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ নারীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদানের ফলে পূর্বের তুলনায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বর্তমানে সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি সাধারণ আসনেও নির্বাচন করছে ও জয়ী হয়ে পরিষদের সদস্য এবং চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে।

আলোচ্য গবেষনার প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, জীবনমান, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হয়। সর্বমোট ২৬ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের সাক্ষাৎকার ও জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহের পর যেখান থেকে দৈবক্রমে বাছাই করে নয় জনের জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো।

কেস ষ্টাডি নং-১
আব্দুর রাজ্জাক
সাধারণ সদস্য
ওয়ার্ড নং-৪
দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ

"অনেক কিছুই করার আছে, তবে অর্থের অভাবে করা সম্ভব হয় না।"

১৯৭৩ সালের ১ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার সবুজবাগ থানার অন্তর্গত দক্ষিণগাঁও গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আব্দুর রাজ্জাক জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোঃ জমির উদ্দিন একজন সরকারী চাকুরিজীবি।

তিনি ১৯৯০ সালে খিলগাঁও মডেল কলেজ হতে এস,এস,সি এবং ১৯৯২ সালে ঢাকা সিটি কলেজ থেকে এইচ,এস,সি পাশ করেন। ২০০০ সালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হতে তিনি ম্যানেজমেন্টে অনার্স সমাপ্ত করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক।

দল প্রসঙ্গে তিনি বলেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন যেহেতু দলীয় পর্যায়ে পড়ে না সে কারণে তিনি নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। দলের প্রভাব মুক্ত থেকে এখানে ভালো কাজ করা যায়। তবে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদেও দলীয় প্রভাব কাজ করছে। সদস্যরা বিরোধী দলের হলে অনেক ক্ষেত্রে কাজ পেতে অসুবিধা হয়।

ইউনিয়নের জন্য তার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অনেক কিছুই করার আছে তবে অর্থের অভাবে করা সম্ভব হয় না। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে রাস্তাঘাট সংস্কার, দুঃস্থ মহিলাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

কেস ষ্টাডি নং-২
মোঃ আকবর হোসেন
সাধারণ সদস্য
ওয়ার্ড নং-৬
দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ

"গ্রামগুলোর দ্রুত উন্নয়ন হলে দেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।"

১৯৬৫ সালে ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার মশাখালি গ্রামে আকবর হোসেন জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা মোঃ মকবুল হোসেন রেওগুয়েতে কর্মরত ছিলেন।

আকবর হোসেন ১৯৮৭ সালে মশাখালি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস,এস,সি ও ১৯৯০ সালে গফরগাঁও সরকারী কলেজ হতে এইচ,এস,সি পাশ করেন। তিনি ছোট-খাটো ব্যবসার সাথে জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও দু সন্তানের জনক।

রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কলেজ জীবন থেকে ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলাম। তাছাড়া আমাদের পরিবারের সকলেই কোন না কোন দলের সাথে জড়িত। তারাই আমাকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহ দিয়েছেন।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও পরিষদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এলাকার উন্নয়ন করার জন্যই নির্বাচন করেছি। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে না হওয়ায় এখানে ভালো কিছু করা সম্ভব। তবে পরিষদ সদস্য হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে এখানে সদস্যরা বিরোধী দলের হলে কাজ পেতে সমস্যা হয়। অর্থাৎ এখানে কিছুটা হলেও দলীয় প্রভাব কাজ করে।

তার মতে ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত গ্রামগুলোর দ্রুত উন্নয়ন হলে দেশ সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে। তিনি সব সময় সুন্দর একটি দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেন।

তিনি বলেন, এলাকাবাসীকে সার্বিক সহযোগিতা দেওযার পাশাপাশি রাস্তাঘাট সংস্কার, সমাজের অনগ্রসর জনগণকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা তার লক্ষ্য।

কেস ষ্টাডি নং-৩
মোঃ ইউসুফ আলী
সাধারণ সদস্য
ওয়ার্ড নং-৫
দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ

"জনগণকে সাহায্য করার জন্য জাতীয় সরকারের কাছে হাত পাততে হয়।"

মোঃ ইউসুফ আলী ১৯৬৪ সালে চাঁদপুর জেলার রাজরাজারশর ইউনিয়নের চোকদারকান্দি গ্রামে এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও তিন সন্তানের জনক।

তিনি গোয়াল নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। পারিবারিক আর্থিক সমস্যার কারণে শিক্ষা জীবন দীর্ঘ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের পরিবারে সরাসরি কেউ রাজনীতির সাথে জড়িত নয়। আমিও হঠাৎ করে নিজেকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করেছি। তবে আমার স্ত্রী ও সন্তানেরা আমাকে প্রচুর উৎসাহ দেয়।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন- এলাকায় উন্নয়নের জন্যই নির্বাচন করেছি। আমাদের এলাকার জনগন অনেক কষ্ট ভোগ করে। ভেবেছিলাম পরিষদের সদস্য হিসাবে অনেক কিছু করতে পারবো। বাস্তবে কিছুই করতে পারিনি। এম,পি শাসিত দেশে এমপিদের কাছে গিয়ে কোন অনুদান পাইনা, তাই জনগণকে কোন সুবিধা দিতে পারি না। জনগণকে সাহায্য করার জন্য জাতীয় সরকারের কাছে আমাদের হাত পাততে হয়। অথচ উন্নত দেশগুলোতে জাতীয় সরকার স্থানীয় সরকারের কাছে হাত পাতে।

তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, অনেক কিছুই করার ইচ্ছা আছে, তবে তা করা সম্ভব নয়। আমার পরিকল্পনা বাস্তাবায়ন করতে হলে ইউনিয়নকে এমপির হস্তক্ষেপ মুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে।

কেস ষ্টাডি নং-৪
রাশিদা বেগম
সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নং-৩ (৭,৮ ও ৯)নং
দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ

"বৈরী আচরণের অবসান ঘটানো না হলে এটাই হবে আমার জীবনের শেষ নির্বাচন।"

রাশিদা বেগম ১৯৬১ সালে ঢাকা জেলার সবুজবাগ থানার মানিকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মরহুম আরাফাত মোল্লা পেশায় ছিলেন কৃষিজীবি। তার স্বামী সাদেক মিয়া ছোট একটি হোটেল পরিচালনা করেন।

তিনি মাদারটেক আব্দুল আজিজ উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অল্প বয়সে বিয়ে হওয়ার কারণে পরবর্তীতে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি চার সন্তানের জননী।

নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, এলাকার মানুষদের সুখে-দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর জন্য নির্বাচন করেছি। এছাড়া আমাদের গ্রামের মেয়েদের জন্য আমি ভালো কিছু করতে চাই, যাতে তাদের উপকার হয়। তবে এখন পর্যন্ত ভিজিএফ কার্ড বিতরণ, ছোট-খাটো বিচার মীমাংসা ছাড়া তেমন কিছু করতে পারিনি। এর মূল কারণ হলো সরকার ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয় না।

ঘর সংসার ও পরিষদের কাজ করতে গিয়ে তিনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হন না। তার পরিবারের সদস্যরা তাকে সব কাজে সহযোগিতা করে।

তিনি বলেন, সংরক্ষিত আসনের সদস্য বলে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। পুরুষ সদস্যরাও তেমন সহযোগিতা করে না। মহিলা সদস্যদের প্রতি বৈরী আচরণের অবসান ঘটানো না এটাই হবে আমার জীবনের শেষ নির্বাচন।

তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি, মেয়েদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

কেস ষ্টাডি নং-৫
মাহমুদা জামান
সংরক্ষিত আসনেরওয়ার্ড নং-১ (১,২,'ও ৩)নং
দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ

"এখানে কাগজে কলমে সদস্যদের ক্ষমতা রয়েছে।"

মাহমুদা জামান ১৯৭৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার বানছারামপুর থানার বাহেরচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা এম.এ ফয়েজ বাংলাদেশ বেতারে কর্মরত ছিলেন। তার স্বামী মোঃ নুরুজ্জামান সরকারী চাকুরিজীবি।

তিনি মাদারটেক আব্দুল আজিজ উচ্চবিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়শোনা করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের কারণে শিক্ষা জীবন দীর্ঘ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও দুই সন্তানের জননী।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে প্রথমে তিনি বলেন, গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি। তার স্বামী তাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন করাই তার মূল লক্ষ্য।

পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের প্রচুর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সম্মূখীন হতে হয়। এখানে কাগজে কলমে সদস্যদের ক্ষমতা রয়েছে বাস্তবে ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। তাই ভালো কোন উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না।

তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা সম্পর্কে বলেন, রাস্তাঘাট সংস্কার, ইউনিয়নের ভেতর স্কুল সংস্কার, মহিলাদের জন্য নারী নির্যাতন, যৌতুক বিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

কেস ষ্টাডি নং-৬
মোঃ আবুল হোসেন
চেয়ারম্যান
নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ

"প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না।"

মোঃ আবুল হোসেন ১৯৬৮ সালের ২৬ জুন ঢাকা জেলার নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ত্রি-মোহনী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৃত, হাজী সুরত আলী পূর্বে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৮৫ সালে মাদারটেক আব্দুল আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় হতে দ্বিতীয় বিভাগে এস,এস,সি ও ১৯৮৫ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারী কলেজ হতে দ্বিতীয় বিভাগে এইচ,এস,সি পাশ করেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও দুই সন্তানের জনক।

রাজনীতিতে জড়িত হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের সকলেই কম বেশী রাজনীতির সাথে জড়িত। আমার বাবাও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনিই আমাকে বিভিন্ন সময় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তবে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন দলীয় ভাবে হয় না। সেজন্য জনগণের জন্য এখানে ভালো কিছু করা সম্ভব। তাই ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি এবং জনগণও আমাকে বিপুল ভোটে জয়ী করেছে।

পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইউনিয়ন পরিষদের বিস্তর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তবে বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। প্রশাসনিক জটিলতার কারণে ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না। ইউনিয়নের উন্নয়ন চাইলে ইউনিয়ন পরিষদকে সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ মুক্ত করে স্বাধীন ভাবে কাজ করার ক্ষমতা দিতে হবে।

তার ভবিষ্যৎ ইচ্ছা সম্পর্কে তিনি বলেন, সমাজের মঙ্গলের জন্য যা যা করা দরকার তা তিনি করবেন। তবে চাঁদাবাজী, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধ করার পাশাপাশি ইউনিয়নের রাস্তাঘাট সংস্কার, নারীদের বিভিন্ন সমস্যা দূর করা তার প্রধান লক্ষ্য।

কেস ষ্টাডি নং-৭
মোঃ মতিউর রহমান মশিউর
সাধারণ সদস্য
ওয়ার্ড নং-৩
নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ

"নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি জনগণকে খেদমত করার জন্য।"

মোঃ মতিউর রহমান ১৯৭৪ সালে ঢাকা জেলার খিলগাঁও থানার অন্তর্গত নাসিরাবাদ ইউনিয়নের দাসেরকান্দি গ্রাম জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা নাজিউর রহমান একজন বেসরকারী চাকুরিজীবি। তিনি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে এবারই প্রথম অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯১ সালে ত্রি মোহনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় হতে তিনি এস,এস,সি ও ১৯৯৩ সালে খিলগাঁও মডেল কলেজ হতে এইচ,এস,সি পাস করেন। একই কলেজ হতে তিনি ১৯৯৫ সালে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে স্থানীয় একটি স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি জনগণকে খেদমত করার জন্য। সাধারণ জনগণ হয়ে সমাজের জন্য যা করা যায় তার চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে। সে কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছি এবং জনগণও আমাকে তাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে।

রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের পরিবারের সকলেই কোন না কোন ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। আমার চাচা দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ ইউপি সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। মূলতঃ চাচার উৎসাহে আমি রাজনীতিতে নিজেকে সম্পৃক্ত করি। এ ছাড়া আমার বড় ভাইও আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছে।

তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, ইউনিয়নের রাস্তাঘাট, স্কুল, মসজিদগুলোর সংস্কার করার পাশাপাশি গ্রামের অসহায় মহিলাদের জন্য বৃত্তিমূলক কিছু করার কথা বলেন।

কেস ষ্টাডি নং-৮
মোসাঃ আছমা খাতুন
সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নং ২ (৪,৫ ও ৬)
নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ

"ভিজি এফ কার্ড ও রিলিফ বিতরনের মধ্যেই ইউপির কাজ সীমাবদ্ধ রয়েছে।"

তিনি ১৯৭৫ সালের ঢাকা জেলার খিলগাঁও থানার অন্তর্গত নাসিরাবাদ ইউনিয়নের দায়েরকান্দি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আশরাফ ব্যাপারী সরকারী চাকুরিজীবি। তার স্বামী বর্তমানে প্রবাস জীবন যাপন করছে।

আসমা খাতুন ১৯৮৯ সালে ত্রি মোহনী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় হতে এস,এস,সি ও ১৯৯১ সালে সালে খিলগাঁও মডেল কলেজ হতে এইচ,এস,সি পাশ করেন। পরবর্তীতে একই কলেজ হতে ১৯৯৩ সালে বি,এ পাশ করেন। বর্তমানে তিনি একটি এন,জি,ও তে কর্মরত রয়েছেন।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রামের মানুষদের জন্য ভালো কিছু করার জন্যই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে এলাকার মহিলাদের কথা চিন্তা করে নির্বাচনে দাড়িয়েছি। এলাকার মানুষ আমাকে নির্বাচন করার জন্য প্রচুর উৎসাহ জুগিয়েছে। তাদের সাহায্য ও সহযোগিতায় আমি নির্বাচনে জয়ী হয়েছি।

পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইউনিয়নের জন্য কাজ করার ইচ্ছে থাকলেও কাজ করার মতো পরিবেশ নেই। ভিজি এফ কার্ড ও রিলিফ বিতরণের মধ্যেই ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সীমাবদ্ধ রয়েছে। উন্নয়নের জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দ পাওয়া যায় না। মহিলা সদস্যরা সব জায়গায় অতিরিক্ত হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের শুধু কাগজে কলমে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, নিজের ওয়ার্ডের উন্নয়ন করার পাশাপাশি দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের জন্য ভালো কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা উল্লেখ করেন।

কেস ষ্টাডি নং-৯
ইয়াসমিন আক্তার
সংরক্ষিত আসনের ওয়ার্ড নং-৩ (৭,৮,৯)
নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ

"বেঁচে থাকলে এ জীবনে কখনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো না।"

ইয়াসমিন আক্তার ঢাকা জেলার খিলগাঁও থানার অন্তর্গত নাসিরাবাদ ইউনিয়নের বাইগদিয়া গ্রামে ১৯৭৬ সালে ২৫ মার্চ এক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯২ সালে মাদারটেক আবদুল আজিজ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস,এস,সি পাশ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অবিবাহিত। বর্তমানে তিনি একটি স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের কারণ সম্পর্কে বলেন, গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য ভালো কিছু করার জন্যই নির্বাচন করেছি। আমার পরিবারের সদস্যরা আমাকে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছে। পাশাপাশি গ্রামের জনগণও নির্বাচনকালীন সময় সব ধরনের সহযোগিতা করেছে। সকলের সহযোগিতায় আমি অবশেষে জয়ী হতে পেড়েছি। অন্যদিকে নির্বাচন পূর্ব বিভিন্ন সমাজ সেবা কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় এলাকায় আমার আলাদা পরিচিত ছিলো। সেটা আমাকে নির্বাচনে জয়ী হতে সাহায্য করেছে।

পরিষদ সম্পর্কে তিনি বলেন, যে আশা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হয়েছিলাম তা নিরাশা হয়ে রইলো। ভেবেছিলাম এলাকায় সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কিছু করবো। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য অনেক কিছু করতে চেয়েছিলাম কিন্তু পারছিনা।

নির্বাচনকালীন সময়ে যে সব ওয়াদা করেছিলাম তার কিছুই জনগণের জন্য করতে পারিনি। তাই এলাকাবাসীর কাছে লজ্জা পাচ্ছি। নিজের বেতনই যেখানে ঠিকমতো পাচ্ছিনা সেখানে জনগণকে ভালো কিছু উপহার দিবো কি করে? নির্বাচনে জিতে একটাই লাভ হয়েছে এখন আমাকে সবাই চেনে। তবে নারী সদস্যদের প্রতি বৈষম্য দূর না হলে বেঁচে থাকলে এ জীবনে কখনও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবো না।

কেস ষ্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের কেস ষ্টাডি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য তারা কাজ করতে আগ্রহী। এ জন্য তারা রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়েও প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাবে উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারছেন না। এর মূল কারণ হিসেবে তারা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক জটিলতাকে দায়ী করেছেন। নারী সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের কাছ থেকে তেমন সহযোগিতা পান না। এছাড়া প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে এলাকার উন্নয়নে কাজ করতে না পারাতে গ্রামবাসী মহিলা সদস্যদের ভালো চোখে দেখছেন না। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় সদস্যদের নিকট আত্মীয় রাজনীতির সাথে জাড়িত ছিল, সে ধারাতেই তারা রাজনীতিতে যোগদানে উৎসাহ পেয়েছে। আবার কিছু সদস্য সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্যই রাজনীতিতে যোগদান করেছে। নির্বাচিত হওয়ার পর সদস্যরা দেখতে পাচ্ছে যে উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে তারা নির্বাচন করেছে, বাস্তবে সে উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব নয়। এখানে তাদের শুধু কাগজে কলমে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। সদস্যদের মতে ইউনিয়নের উন্নয়ন চাইলে পরিষদের উপর প্রশাসনিক হস্ত ক্ষেপ কমাতে হবে। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদকে কাজ করার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। তবেই ইউনিয়ন পরিষদ সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

তথ্য বিশ্লেষণঃ জনসাধারণের মতামত জরিপ

সাধারণ তথ্যাবলী ঃ তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য বাংলাদেশের দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৯০ জন ব্যক্তির মতামত জরিপ করা হয়। মতামত গ্রহণের জন্য বিশেষ ধরনের প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৪৫ জন ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৪৫ জন মোট ৯০ জন ব্যক্তিকে মতামত গ্রহণের জন্য দৈব ভাবে নির্বাচিত করা হয়। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ৪৮ জন পুরুষ ও ৪২ জন মহিলা ছিলেন।

মতামত প্রদানকারী পেশাঃ

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন পেশার মানুষ মতামত জরিপে অংশগ্রহন করে। ১৩% শিক্ষক তাদের মতামত প্রদান করেন যার মধ্যে প্রাথমিক ও হাইস্কুল পর্যায়ের শিক্ষক রয়েছে। স্নাতক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ১৩% শিক্ষার্থীর মতামত গৃহীত হয়। মতামত প্রদানকারীদের ১৬% ছিলো ব্যবসায়ী, এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসার (চায়ের ষ্টল, মুদির দোকানদার, তরকারী বিক্রেতা) সাথে জড়িত। এছাড়া ১৮% গৃহবধূ, মৎসজীবি ৭%, কৃষক ১১%, মাঝি ৯%, এবং চাকুরীজীবী ১৩% তাদের মতামত প্রদান করেন। চাকুরিজীবিদের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী উভয়ই ছিলো।

৪.১ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের পেশা

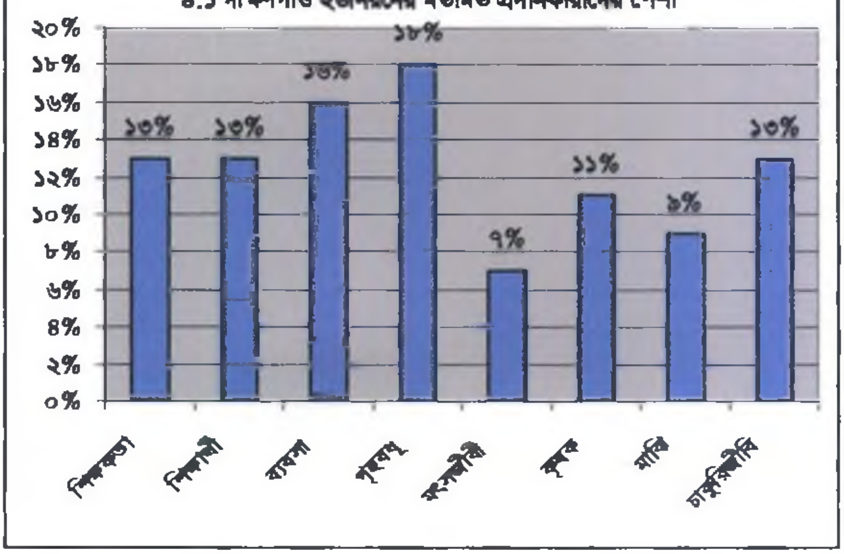

নাসিরাবাদ ইউনিয়নের প্রাইমারী ও হাইস্কুল পর্যায়ের ১৫% শিক্ষক তাদের মতামত প্রদান করেন। এদের মধ্যে ৮% ছিলো পুরুষ শিক্ষক ও ৭% মহিলা শিক্ষক। বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত ১১% শিক্ষার্থী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া ব্যবসায়ী ১১%, গৃহবধূ ১৬%, মৎসজীবি ৯%, কৃষক ১৩%, মাঝি ৯% এবং চাকুরীজীবি ১৬% কাছ থেকে মতামত গৃহীত হয়।

রেখাচিত্র ৪.২ ঃ নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের পেশা

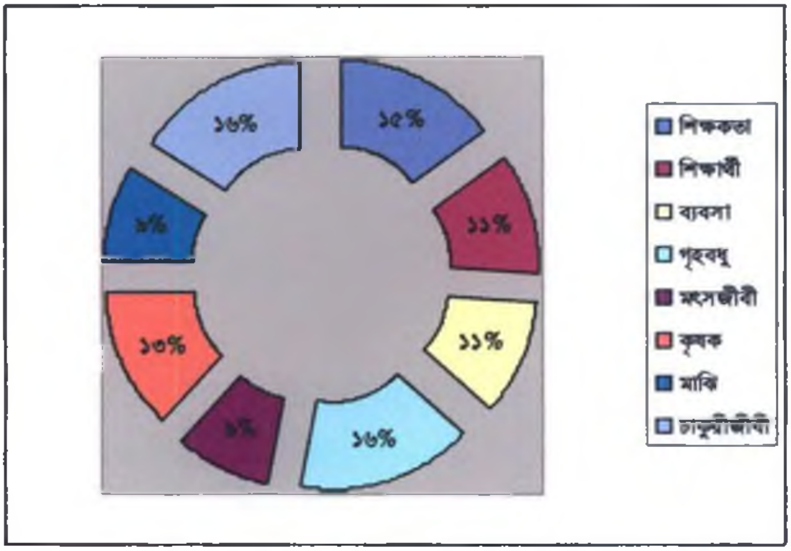

সারণী ৪.২ঃ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের পেশা

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন					নাসিরাবাদ ইউনিয়ন				
পেশা	পুরুষ	মহিলা	একত্রে	শতকরা	পেশা	পুরুষ	মহিলা	একত্রে	শতকরা
শিক্ষকতা	২	৪	৬	১৩	শিক্ষকতা	৩	৪	৭	১৫
শিক্ষার্থী	৩	৩	৬	১৩	শিক্ষার্থী	২	৩	৫	১১
ব্যবসা	৪	৩	৭	১৬	ব্যবসা	৩	২	৫	১১
গৃহবধূ	-	৮	৮	১৮	গৃহবধূ	-	৭	৭	১৬
মৎসজীবী	৩	-	৩	৭	মৎসজীবি	৪	-	৪	৯
কৃষক	৫	-	৫	১১	কৃষক	৬	-	৬	১৩
মাঝি	৪	-	৪	৯	মাঝি	৪	-	৪	৯
চাকুরিজীবি	২	৪	৬	১৩	চাকুরিজীবি	৩	৪	৭	১৬
মোট	২৩	২২	৪৫	১০০	মোট	২৫	২০	৪৫	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমাঃ

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের বিভিন্ন ব্যক্তির বয়স সীমার কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়েছে। ১৬ থেকে ২৫ বছরের ২৪%, ২৬ থেকে ৩৫ বছরের ২৭%, ৩৬ থেকে ৪৫ বছরের ২৭%, ৪৬-৫৬ বছরের ১১% এবং ৫৬ থেকে ৬৫ বছর বয়সের ১১% উত্তরদাতা রয়েছে।

রেখা চিত্র ৪.৩ ঃ দক্ষিণ গাঁও ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের বয়স

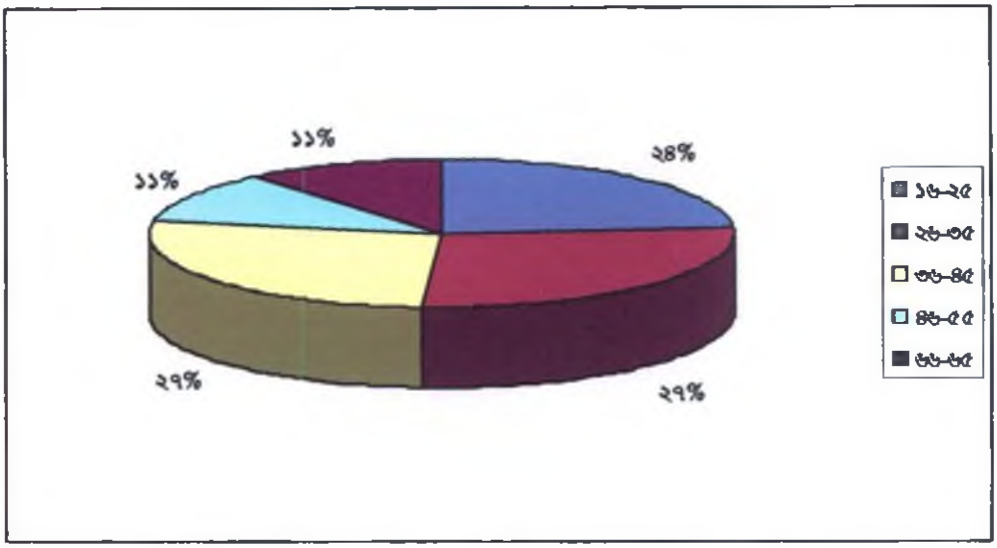

নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ১৬ হতে ২৫ বছরের ২২%, ২৬ হতে ৩৫ বছরের ২৯% ৩৬ হতে ৪৫ বছরের ২৯%, ৪৬ হতে ৫৫ বছরের ১৩%, এবং ৫৬ হতে ৬৫ বছরের ৭% বয়সসীমার কাছ থেকে মতামত গৃহীত হয়।

রেখাচিত্র ৪.৪ঃ নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা

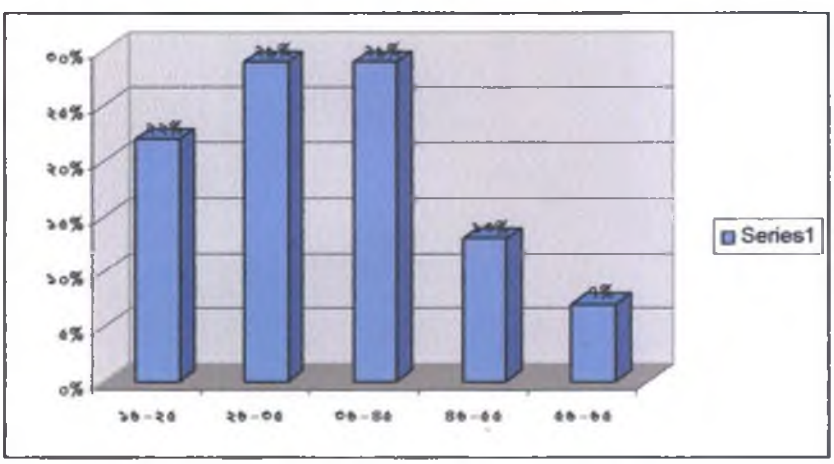

সারণী ৪.৩ঃ দক্ষিণগাঁও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতমাত প্রদানকারীদের বয়সসীমাঃ

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন					নাসিরাবাদ ইউনিয়ন				
বয়সসীমা	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতকরা	বয়সসীমা	পুরুষ	মহিলা	মোট	শতকরা
১৬-২৫	৫	৬	১১	২৪	১৬-২৫	৫	৫	১০	২২
২৬-৩৫	৬	৬	১২	২৭	২৬-৩৫	৫	৮	১৩	২৯
৩৬-৪৫	৪	৮	১২	২৭	৩৬-৪৫	৮	৫	১৩	২৯
৪৬-৫৫	৩	২	৫	১১	৪৬-৫৫	৪	২	৬	১৩
৬৬-৬৫	৫	-	৫	১১	৫৬-৬৫	৩	-	৩	৭
মোট	২৩	২২	৪৫	১০০	মোট	২৫	২০	৪৫	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

দক্ষিণাগাঁও ইউনিয়নের মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্যে দেখা যায় নিরক্ষর জনগণ ১৬% এবং অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন ৮৪% জনগণ রয়েছে। এই ৮৪% জনগণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ৭%, মাধ্যমিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ থেকে দশম),এস.এস.সি ১১%, এইচ, এস. সি ২৪%, স্নাতক ১১%, এবং মাষ্টার্স ৫% ভাগ রয়েছে।

রেখাচিত্র ৪.৫ঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

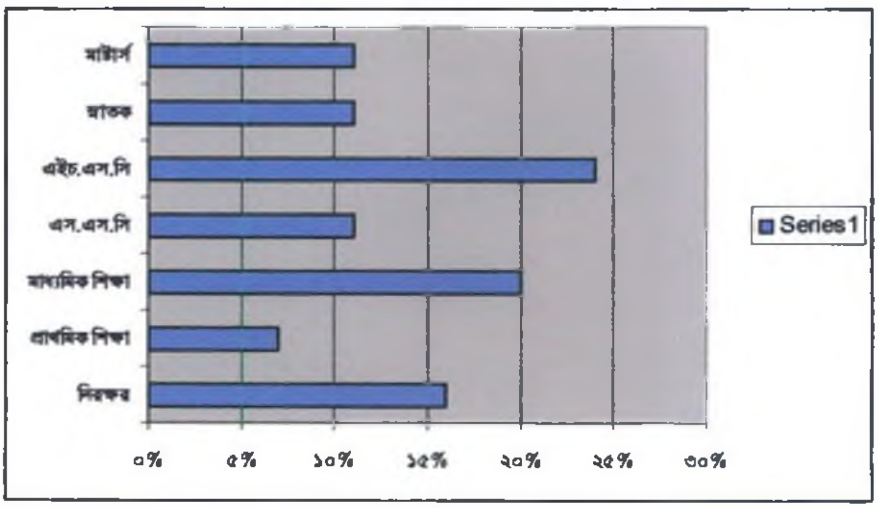

অপরদিকে নাসিরাবাদ ইউনিয়নে মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১৮% নিরক্ষর ছিলো যারা নাম সই করতে পারে না, ৮২% জনগণ ছিলো অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন যারা বিভিন্ন পর্যায়ের

শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলো। এর মধ্যে মাষ্টার্স পর্যায়ে ছিলো ৯% স্নাতক ১৬%, এইচ,এস.সি, ১৩% এস.এস.সি ৯% এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত মতামত প্রদানকারী ছিলো ১১% ও ২৫%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জনগণ ছাড়াও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন জনগণও রয়েছেন যেটা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যতম বিষয় হিসেবে ধরা যায়।

রেখাচিত্র ৪.৬ঃ নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

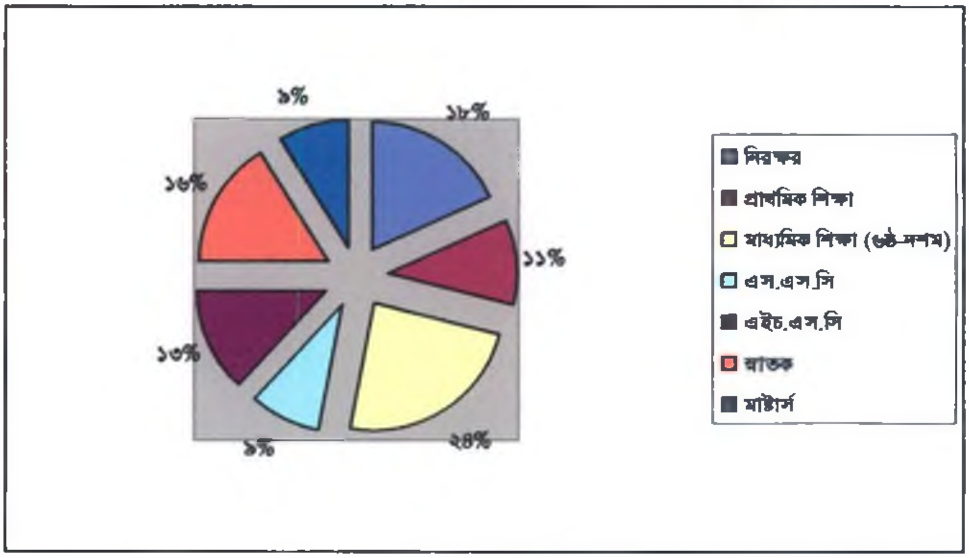

সারণী ৪.৪ঃ মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
ডিগ্রী	সংখ্যা	শতকরা	ডিগ্রী	সংখ্যা	শতকরা
নিরক্ষর	৭	১৬	নিরক্ষর	৮	১৮
প্রাথমিক শিক্ষা	৩	৭	প্রাথমিক শিক্ষা	৫	১১
মাধ্যমিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ-দশম)	৯	২০	মাধ্যমিক শিক্ষা (৬ষ্ঠ-দশম)	১১	২৪
এস.এস.সি	৫	১১	এস.এস.সি	৪	৯
এইচ.এস.সি	১১	২৪	এইচ.এস.সি	৬	১৩
স্নাতক	৫	১১	স্নাতক	৭	১৬
মাষ্টার্স	৫	৫	মাষ্টার্স	৪	৯
মোট	৪৫	১০০	মোট	৪৫	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

প্রদানকৃত মতামত বিষয়ক তথ্যের বিশ্লেষণ ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত জনগণের মতামত জরিপে দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়। তাদের উত্তরের ভিত্তিতে ইউনিয়ন বিষয়ক মতামত বিশ্লেষিত হলো।

⇒ **ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাথে আপনার কি পরিচয় আছে?** এ প্রশ্নের উত্তরে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৮৪% উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের সাথে পরিষদের সদস্যদের পরিচয় রয়েছে এবং ১৫% উত্তরদাতার সাথে পরিষদের সদস্যদের পরিচয় নেই বলে জানিয়েছেন। অপরদিকে নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৯১% পরিষদ সদস্যদের সাথে পরিচয় রয়েছে ৯% উত্তরদাতার সাথে পরিচয় নেই বলে জানিয়েছেন।

⇒ **আপনি কি মনে করেন পরিষদের সদস্যদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা তারা যথাযথ পালন করেন?** এ প্রশ্নের উত্তরে দুটি ইউনিযনের সদস্যরা নিম্নের মতামত প্রদান করেছেন।

সারণী ৪.৫ঃ পরিষদের উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রসঙ্গে মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
মতামত	সংখ্যা	শতকরা	মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৫	৩৩	হ্যাঁ	৩৮	৮৪
না	১৯	৪২	না	৪	৯
বুঝতে পারি না	১১	২৫	বুঝতে পারি না	৩	৭
মোট	৪৫	১০০	মোট	৪৫	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৩৩% উত্তরদাতা মনে করে পরিষদের সদস্যরা অর্পিত দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করছে এবং ৪২% মনে করে তারা সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করছে না। অন্যদিকে ২৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন পরিষদের সদস্যরা যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা এটা তারা বুঝতে পারে না।

অপরদিকে নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৮৪% উত্তরদাতা জানিয়েছেন পরিষদ সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করছে এবং ৯% মনে করে পরিষদ সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করছে না। এছাড়া ৭% উত্তরদাতা জানিয়েছে পরিষদের দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই।

⇒ **সদস্যরা কি কাজের সময় এলাকাবাসীর সহযোগিতা পায়?** এ প্রশ্নের উত্তরে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৮৯% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৮৯% উত্তরদাতা জানিয়েছেন এলাকার যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড কিংবা দুর্যোগকালীন সময়

এলাকার জনগণ পরিষদকে পূর্ণ সহযোগীতা করে। অপরদিকে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ১১% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ১২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন সদস্যরা কাজের সময় এলাকাবাসীর সহযোগিতা পায় না।

পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজ সম্পর্কে

⇒ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের উত্তরদাতারা জানিয়েছেন মহিলা সদস্যরা সাধারণতঃ সমাজ কল্যাণ সংক্রান্ত কাজ করে । অপরদিকে পুরুষ সদস্যরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ দেখাশোনা করেন । যে সব কাজ অর্থ সংশ্লিষ্ট সে সব কাজে মহিলাদের তার কম সম্পৃক্ত হতে দেখেছেন।

সারণী ৪.৬ঃ পরিষদের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের ধরণ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ	সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কাজ
রাস্তা নির্মাণ	ভিজিডি কর্মসূচী
পানীয় জল ও স্যানিটেশন	বৃদ্ধ ভাতা
পরিবেশ ও দুর্যোগ	রিলিফ বিতরণ
দারিদ্র্য নিরসণ	

উৎসঃ মাঠ জরিপ

⇒ উত্তরদাতারা মনে করে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের মধ্যে বৈষম্যে রয়েছে। পুরুষ সদস্যরা বিভিন্ন প্রকল্প নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। তারা মহিলা সদস্যদের অযোগ্য মনে করে। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি তাদের দিয়ে থাকে। তারা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে মহিলাদের সম্পৃক্ত করে না। মহিলাদের কাজের জন্য পুরুষ সদস্যদের পিছনে ঘুরতে হয়।

ইউনিয়ন উন্নয়ন কম্পর্কেঃ

⇒ **আপনার এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে কি?** এই প্রশ্নের উত্তর দুটো ইউনিয়নের সদস্যদের মতামত নিম্নরূপ।

দক্ষিণদাঁও ইউনিয়নের ৯% উত্তরদাতা মনে করে তাদের এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। ৫৮% মনে করে তাদের এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। ১১% উত্তরদাতা মনে করে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে এবং ২২% মনে করে তারা ঠিক বুঝতে পারে না,

উন্নয়ন হয়েছে কিনা। অর্থাৎ ইউনিয়নের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে জনগণের মাঝে এক ধরণের মিথস্ক্রিয়া রয়েছে।

সারণী ৪.৭ঃ উন্নয়ন সম্পর্কে ইউনিয়নবাসীদের মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
মতামত	সংখ্যা	শতকরা	মতামত	সংখ্যা	শতকরা
হয়েছে	৪	৯	হয়েছে	২৮	১৩
হয়নি	২৬	৫৮	হয়নি	৬	৬২
কিছু কিছু	৫	১১	কিছু কিছু	৩	৭
বুঝতে পারি না	১০	২২	বুঝতে পারি না	৮	১৮
মোট	৪৫	১০০	মোট	৪৫	১০০

উৎসঃ মাঠ জরিপ

নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ১৩% উত্তরদাতা মনে করে তাদের ইউনিয়নে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, ৬২% মনে করে উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। অন্যদিকে ৭% উত্তরদাতা মনে করে কিছু কিছু উন্নয়ন হয়েছে ১৮% উত্তরদাতা মনে করে উন্নয়নমুলক কাজ হয়েছে কি-না এটা তারা বুঝতে পারে না।

উপরোক্ত সারণী বিশ্লেষণে বলা যায় ইউয়িন পরিষদ ব্যবস্থা ইউনিয়নগুলিতে উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনায় তেমন ভূমিকা রাখছে না।

⇒ **আপনার এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা এ পর্যন্ত কিকি উন্নয়মূলক কাজ করেছে?** এ প্রশ্নের উত্তরে দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীরা নিম্নলিখিত মতামত প্রদান করেছে।

সারণী ৪.৮ঃ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নে উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
উন্নয়ন কাজ	সংখ্যা	শতকরা	উন্নয়ন কাজ	সংখ্যা	শতকরা
রাস্তা মেরামত	৩৩	৭৩	রাস্তাঘাট নির্মাণ	২২	৪৯
বন্যার্তদের সাহায্যে	৭	১৬	ত্রাণ বিতরণ	১১	২৪
রিলিফের খোজ খবর	৩	৭	বিপদ আপদে সাহায্য	৮	১৮
ঋণ সহায়তা	২	৪	পানির ব্যবস্থা	৪	৯
মোট	৪৫	১০০	মোট	৪৫	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণী হতে প্রতীয়মান হয় যে দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজে তাদের ধারণা একেবারেই কম। এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তরদাতাদের কেউ কেউ একের অধিক মতামত প্রদান করেছে। তবে দুটি ইউনিয়নের অধিকাংশ উত্তরদাতার কাছ থেকে রাস্তা সংস্কারের কাজটি বারবার এসেছে।

মহিলা প্রতিনিধি সম্পর্কে

⇒ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৭১% উত্তরদাতা মনে করেন মহিলা মেম্বারের চেয়ে পুরুষ মেম্বাররা ভালো কাজ করে। পুরুষ মেম্বারদের যে কোন কাজে যে কোন সময় সহজে পাওয়া যায়। পুরুষ মেম্বাররা যে কোন সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে পারে। মহিলারা সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়। অপরদিকে ২৯% উত্তরদাতা মনে করে মহিলা সদস্যরা পুরুষ সদস্যদের তুলনায় কাজের ক্ষেত্রে বেশী আন্তরিক। মহিলাদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হলে তারা আরো ভালো করবে।

নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৭৩% উত্তরদাতা পুরুষ মেম্বারদের সমর্থন করেছেন। তাদের মতে পুরুষ মেম্বাররা অধিকতর কর্মঠ। ২৭% উত্তরদাতা মহিলা সদস্যদের সমর্থন করেছেন, এদের অধিকাংশই ছিলো নারী।

⇒ তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে জনগণ নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন।

সারণী ৪.৯ঃ সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যদের নির্বাচিত হওয়া প্রসঙ্গে মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা	উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২৭	৬০	হ্যাঁ	৩১	৬৯
না	৯	২০	না	৮	১৮
মতামত নেই	৯	২০	মতামত নেই	৬	১৩
মোট	৪৫	১০০	মোট	৪৫	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৬০% উত্তরদাতা এই পদ্ধতি সমর্থন করেছেন। ৯% মতামত দান হতে বিরত থাকে। অপরদিকে নাসিবাবাদ ইউনিয়নের ৬৯% উত্তরদাতা এই পদ্ধতির পক্ষে মত দেন এবং ১৩% মতামত প্রদান হতে বিরত থাকেন।

দুটো ইউনিয়নের বিপক্ষে মতামত প্রদানকারীদের মতে এই প্রক্রিয়ার ফলে পুরুষ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটাবে।

⇒ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৬০% উত্তরদাতা মনে করে ইউনিয়নের অর্ধেক জনগোষ্ঠী যেহেতু নারী তাই পরিষদ নির্বাচনে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এ পদ্ধতিতে মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৬৯% উত্তরদাতার মতে আসন সংরক্ষিত হলে মহিলারা সহজেই নির্বাচিত হতে পারবে। অন্যদিকে পরিষদে মহিলা সদস্য থাকলে গ্রামের মহিলারা তাদের সমস্যাগুলি মহিলা সদস্যদেরকে সহজেই জানাতে পারবে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় মহিলা প্রতিনিধিরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা তারা পরবর্তীতে পালন করেন নি। উত্তরদাতারা জানিয়েছেন তাদের কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয় না।

⇒ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৬২% উত্তরদাতা বলেছেন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা নিরাপদে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন ও ৩৮% বলেছেন মহিলা প্রতিনিধিরা নিরাপদে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৮৯% মনে করে মহিলারা নিরাপদে দায়িত্ব পালন করছেন ১১% মনে করে মহিলারা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

⇒ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৮০% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৬৭% উত্তরদাতা মনে করেন মহিলা প্রতিনিধি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। তাদের মতে পুরুষ ও মহিলাদের আসন সমান ভাবে বন্টন হওয়া উচিৎ। অন্যদিকে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ২০% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৩৩% উত্তরদাতা মনে করে মহিলা প্রতিনিধি বাড়ানোর দরকার নেই।

⇒ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৭৬% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৮৪% উত্তরদাতা মনে করেন মহিলা প্রতিনিধিদের সহযোগিতা করার জন্য জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া ২৪% ও নাসিরাবাদ উইনয়নের ১৬% উত্তরদাতা মনে করেন মহিলা প্রতিনিধিদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার দরকার নেই।

মহিলাদের রাজনীতি সম্পর্কে

⇒ **মহিলাদের রাজনীতিতে কতটুকু অংশগ্রহণ করা উচিৎ?** এই প্রশ্নের উত্তরে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৩১% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৩৮% উত্তরদাতার মতে ভোট দানের মধ্যে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ। অপরদিকে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৬৯% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৬২% উত্তরদাতা মনে করেন মহিলাদের রাজনীতির সব ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করা উচিৎ বলে উত্তরদাতারা জানিয়েছেন।

⇒ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের উত্তরদাতারা রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাঁধার কথা উল্লেখ করেছেন। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ৩১% পারিবারিক বাঁধা, নিরাপত্তার অভাব ৪০% সামাজিক বাঁধা ১৬% ও ধর্মীয় বাধা ১৩% বলে জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে অনেকে একের অধিক মতামত প্রদান করেছেন।

সারণী ৪.১০ঃ মহিলাদের রাজনীতি অংশগ্রহন প্রসঙ্গে মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
মতামত	সংখ্যা	শতকরা	মতামত	সংখ্যা	শতকরা
সামাজিক	৭	১৬	সামাজিক	১১	২৪
ধর্মীয়	৬	১৩	ধর্মীয়	৪	৯
নিরাপত্তার অভাব	১৮	৪০	পারিবারিক	১৮	৪০
পারিবারিক	১৪	৩১	নিরাপত্তার অভাব	১২	২৭
মোট	৪৫	১০০	মোট	৪৫	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

নাসিরাবাদ ইউনিয়নের উত্তরদাতাদের রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব ২৭%, সামাজিক বাঁধা ২৪% ও ধর্মীয় বাঁধা ৯% বলে জানিয়েছেন।

উত্তরদাতাদের মতে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের বাঁধাগুলি দূর করতে হলে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

সরকারী বরাদ্দ সম্পর্কেঃ

⇒ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৮৪% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৭৩% উত্তরদাতা মনে করেন উন্নয়নের জন্য সরকার যে অর্থ দেয় তা যথাযথ ভাবে ব্যয় হয় না। অর্থ সঠিক ভাবে ব্যবহার না হওয়ার কারণ হিসেবে তারা দুর্নীতির কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ১৬% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ২৭% মনে করেন সরকারী বরাদ্দ সঠিক ভাবে ব্যয় হয়।

⟹ ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য আরো বেশী টাকা বরাদ্দ দেওয়ার কথা বলেছেন উত্তরদাতারা। তাদের মতে সরকার যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ দেয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। সরকারের উচিৎ উন্নয়নের জন্য আরো অধিক হারে অর্থ বরাদ্দ করা। অপরদিকে অর্থ বরাদ্দের বিপক্ষে মতামত প্রদানকারীদের মতে যে টাকা সরকার প্রদান করে তা সঠিক ভাবে ব্যয় হয় না, তাই বাড়তি অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন নেই।

চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সম্মানি প্রসঙ্গেঃ

⟹ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের যথাক্রমে ৪৭% ও ৬২% উত্তরদাতা মনে করে বর্তমানে পরিষদের সদস্যদের মাসিক ভাতা যা দেওয়া হয় তা যথেষ্ট নয়। তাদের মতে বর্তমানে প্রদেয় অর্থের দ্বিগুণ অর্থ তাদের মাসিক ভাতা হিসাবে দেওয়া উচিৎ। অন্যদিকে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৫৩% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৩৮% উত্তরদাতার মতে তাদের কাজ অনুযায়ী বর্তমান ভাতাই যথেষ্ট।

ভোট প্রসঙ্গেঃ

⟹ **আপনি কি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেছিলেন?** এ প্রশ্নের উত্তরে ৮২% উত্তরদাতা বলেছেন তারা ভোট দেয়, ১৮% উত্তরদাতা বলেছেন তারা ভোটদান হতে বিরত থাকে। অপরদিকে ৮০% উত্তরদাতা নিজেদের ইচ্ছায় ভোট প্রদান করে এবং ২০% অন্যের ইচ্ছায় ভোট দিয়ে থাকে।

নিরাপত্তা পায় ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন অন্যদিকে ১৬% মতামত প্রদানকারী জানিয়েছেন মহিলারা ভোট প্রদান করে না।

এনজিও প্রসঙ্গে ঃ

⇒ **আপনার এলাকার এনজিও গ্রাম উন্নয়নে কি ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে?** এ প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতারা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন-

সারণী ৪.১৩ঃ গ্রাম উন্নয়নে এনজিওদের কর্মসূচী

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
কর্মসূচীর নাম	গণসংখ্যা	শতকরা	মতামত	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
ঋণদান কর্মসূচী	১৬	৩৬	ঋণদান কর্মসূচী	১৯	৪২
শিক্ষা	১১	২৪	শিক্ষা	১০	২২
পরিবার পরিকল্পনা	৮	১৮	পরিবার পরিকল্পনা	৮	১৮
স্বাস্থ্য	৪	৯	বলতে পারেনা	৮	১৮
বলতে পারেনা	৬	১৩			
মোট	৪৫	১০০	মোট	৪৫	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৩৬% উত্তরদাতা ঋণদান কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে ২৪%, পরিবার পরিকল্পনা ১৮%, স্বাস্থ্য ৯% এবং কর্মসূচী বলতে পারেনা১৩%।

নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৪২% ঋণদান কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত রয়েছেন, ২২% শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা ১৮% এবং ১৮% কর্মসূচী বলতে পারে না। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য উত্তরদাতার অধিকাংশই ঋণদান কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত রয়েছে।

⇒ এনজিওদের কার্যক্রমের ফলে গ্রামের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণের মতামত।

সারণী ৪.১৪ঃ এনজিওদের কাজের ইতিবাচক পরিবর্তন

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
পরিবর্তনের ক্ষেত্র	গণসংখ্যা	শতকরা	পরিবর্তনের ক্ষেত্র	গণসংখ্যা	শতকরা
আয়বৃদ্ধি	১৪	৩১	আয়বৃদ্ধি	১৭	৩৮
শিক্ষা	৭	১৬	শিক্ষা	৮	১৮
স্বাস্থ্য	৫	১১	পরিবার পরিকল্পনা	১১	২৪
পরিবর্তন হচ্ছে না	১৯	৪২	পরিবর্তন হচ্ছে না	৯	২০
মোট	৪৫	১০০	মোট	৪৫	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যাচ্ছে ৩১% উত্তরদাতা মনে করে আয় বৃদ্ধি হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৬% ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ১১% উত্তরদাতা ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ৪২% উত্তরদাতা মনে করে কোন পরিবর্তন হচ্ছেনা।

অপরদিকে নাসিরাবাদ ইউনিয়নের আয় বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ৩৮% শিক্ষা ক্ষেত্রে ১৮%, পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এবং ২৪% উত্তরদাতা মনে করে এনজিও কর্মসূচী আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। ২০% উত্তরদাতা মনে করে কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে ঃ

⇒ **গ্রাম সরকার গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে কি?** এ প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত-

সারণী ৪.১৫ঃ গ্রাম সরকার প্রসঙ্গে উত্তরদাতাদের মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা	উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	-	-	হ্যাঁ	-	-
না	৩১	৬৯	না	২৮	৬২
বুঝতে পারিনা	১৪	৩১	বুঝতে পারিনা	১৭	৩৮
মোট	৪৫	১০০	মোট	৪৫	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৬৯% উত্তরদাতা মনে করে গ্রাম সরকার গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে না, ৩১% উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা ঠিক বুঝতে পারে না।

দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণ।

সাধারণ তথ্যাবলী ঃ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মোট ১৮ জন ওয়ার্ড সদস্য, দুইজন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ছয়জন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যর সাক্ষাৎ গ্রহণ করা হয়। তাদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের স্বরূপ উদঘাটন করা হয়।

ওয়ার্ড সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রাইমারী পাশ ৩ জন (২৫%), হাইস্কুল পাশ ৪ জন (৩১%), এস,এস,সি, পাশ ২ জন (২৫%) এইচ,এস,সি ২ জন (১৫%) ও স্নাতক পাশ রয়েছে ২ জন যার শতকরা হার ১৫%।

সারণী ৪.১৬ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা
প্রাইমারী পাশ	৩	২৪	প্রাইমারী পাশ	২	১৫
হাইস্কুল (৬ষ্ঠ-দশম)	৪	৩১	হাইস্কুল (৬ষ্ঠ-দশম)	৩	২৪
এস,এস,সি	২	১৫	এস,এস,সি	২	১৫
এইচ,এস,সি	২	১৫	এইচ,এস,সি	২	১৫
স্নাতক	২	১৫	স্নাতক	৪	৩১
মোট	১৩	১০০	মোট	১৩	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের ১৫% প্রাইমারী পাশ, হাইস্কুল পর্যায় ২৪%, এস,এস,সি ১৫%, এইচ,এস,সি ১৫% ও স্নাতক পাশ রয়েছেন ৩১%।

ইউনিয়নের পরিষদ সদস্যদের পেশাঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের মধ্যে ৮ জন (৬২%) ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছেন। এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে কেউ কেউ মুদির দোকান, চায়ের স্টল পরিচালনা করে। ২ জন সদস্য (১৫%) কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এরা সাধারণতঃ মৌসুমী ফসল চাষ করে থাকে। সংরক্ষিত মহিলা আসনে তিন জন সদস্য গৃহিনী বলে জানিয়েছেন। তবে তারা ব্যক্তিগত ভাবে হাস-মুরগী, গরু-ছাগলের খামার পরিচালনা করে।

সারণী ৪.১৭ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের পেশাগত অবস্থান

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
পেশা	সংখ্যা	শতকরা	পেশা	পেশা	শতকরা
ব্যবসা	৮	[illegible]	ব্যবসা	৬	৪৭
গৃহস্থ	২	১৫	কন্ট্রাক্টর	২	১৫
গৃহিনী	৩	২৩	গৃহস্থ	২	১৫
-	-	-	এনজিও কর্মী	৩	২৩
মোট	১৩	১০০	মোট	১৩	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ৬ জন সদস্য (৪৭%) বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের মধ্যে কেউ কেউ মুদির দোকান ও হোটেল ব্যবসার সাথে জড়িত। ২ জন সদস্য (১৫%) কন্ট্রাকটারী ও ২ জন সদস্য চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৩ জন (২৩%) স্থানীয় এন.জি.ও তে কর্মরত রয়েছেন।

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাসিক আয়ঃ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের আয় সংক্রান্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় ৩ জন (২৩%) মাসে ৪০০০ হাজার টাকার নীচে আয় করে এবং ৪ জন (৩১%) ৫-৭ হাজার টাকার মধ্যে আয় করে। অন্যদিকে ৬ জন (৪৬%) সদস্য ১০ হাজার টাকার নীচে আয় করে। ৫-৭ হাজার ও ১০,০০০ টাকার আয়কে সন্তোষজনক মনে হলেও এই আয় সীমার মধ্যে কোন মহিলা সদস্য নেই।

সারণী ৪.১৮ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের মাসিক আয়

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা	মাসিক আয়	সংখ্যা	শতকরা
৪০০০ এর নীচে	৩	২৩	৪০০০ এর নীচে	৪	৩১
৫০০০-৭০০০	৪	৩১	৫০০০-৭০০০	৬	৪৬
১০,০০০ এর নীচে	৬	৪৬	১০,০০০ এর নীচে	৩	২৩
মোট	১৩	১০০	মোট	১৩	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ৪ জন (৩১%) ৪০০০ টাকার নীচে এবং ৬ জন (৪৬%) ৫০০০-৭০০০ টাকার মধ্যে আয় করে। এছাড়া ৩ জন (২৩%) ১০,০০০ টাকার নীচে আয় করে, তবে এই আয় সীমার মধ্যে কোন মহিলা সদস্য নেই।

ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের বয়সঃ

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের ২৫% সদস্যর বয়স ৩০ এর নীচে। ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে ৩১%, ৩৫-৪০ বছরের মধ্যে ৩৯% এবং ৪০-৪৫ বছর বয়স সীমার

মধ্যে ১৫% সদস্য রয়েছে। তবে ৩৫ হতে ৪০ বছরের সদস্য সবচেয়ে বেশী আছে।

সারণী ৪.১৯ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের বয়স

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
বয়স	সংখ্যা	শতকরা	বয়স	সংখ্যা	শতকরা
৩০ এর নীচে	২	১৫	৩০ এর নীচে	৩	২৩
৩০-৩৫	৪	৩১	৩০-৩৫	২	১৫
৩৫-৪০	৫	৩৯	৩৫-৪০	৩	২৩
৪০-৪৫	২	১৫	৪০-৪৫	৫	৩৯
মোট	১৩	১০০	মোট	১৩	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ৩০ বছরের নীচে ৩ জন সদস্য রয়েছে যার শতকরা হার ২৩% এবং ৪০-৪৫ বছরের বয়স সীমার মধ্যে ৫ জন সদস্য রয়েছে যার শতকরা হার ৩৯%। অন্যদিকে ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে ২ জন ও ৩৫ হতে ৪০ বছরের ৩ জন সদস্য রয়েছে যার শতকরা হার যথাক্রমে ১৫% ও ২৩%। নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদে ৪০-৪৫ বছরের সদস্য সবচেয়ে বেশী রয়েছে।

দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদ্বয়ের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এলাকার উন্নয়নে সন্ত্রাস দমন, রাস্তা প্রশস্ত করণ, কৃষি উন্নয়ন, যৌতুক বিরোধী অভিযান, শিক্ষার মান বৃদ্ধিকরণ, স্যানিটেশন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে, এ সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হবে। এলাকার উন্নয়নে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী বলে তারা উল্লেখ করেন।

⇒ চেয়ারম্যান কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের পর সরকার ও প্রশাসন থেকে তেমন সাহায্য সহযোগিতা তারা পাননা। প্রশাসন তাদের শুধু মৌখিক সমর্থন দিয়ে থাকেন ও আশার আলো দেখান। এছাড়া চেয়ারম্যান প্রয়োজনে থানার সহযোগিতা পায়না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের হেয় করে অসহযোগিতা মূলক আচরণ করে থাকে। এতে করে তারা এলাকাবাসীর কাছে বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়।

⇒ তাদের মতে পরিষদ সংক্রান্ত সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো সঠিক নয়।

⇒ পরিষদের চেয়ারম্যানদ্বয় কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য।

⇒ তারা ইউনিয়নের অধিবাসীদের পরামর্শ দিয়ে, অর্থ দিয়ে, কাজ দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের সভা মাসে একবার হয় এবং এ সভায় ইউনিয়নের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়।

⇒ তারা মনে করেন সরকারী ভাবে যে ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়েছে তা কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তাই কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাদের মতে ইউনিয়ন পরিষদ সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ মুক্ত হলে পরিষদে তাদের ক্ষমতা চর্চা সহজ হবে। এবং বর্তমানে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

⇒ তাদের মতে ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে হলে সরাসরি অর্থ বরাদ্দ, পরিষদ পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা, পরিষদের সাথে থানার সমন্বয়, পরিষদের পছন্দ মতো প্রকল্প বাছাই এবং পরিষদের উপর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ মুক্ত করার কথা বলেছেন। তাদের মতে ইউনিয়ন পরিষদ অর্থনৈতিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। এই সীমাবদ্ধতাও সরকারকে দূর করথে হবে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদকে অর্থনৈতিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর হতে নির্ভরশীলতা কমাতে হলে স্থানীয় ভাবে সম্পদ আহরণের ক্ষমতা প্রদান করতে হবে। এছাড়া অর্থ সংক্রান্ত যে সব ক্ষমতা পরিষদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তারা উল্লেখ করেন।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বছরে যে বাজেট তৈরী হয় তা দিয়ে জনকল্যাণ সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় বাজেটে ইউনিয়ন পরিষদগুলোর জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া উচিৎ।

⇒ যে সব আইনের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিচালিত হয় সেগুলো সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এছাড়া পরিষদের সদস্যদের দায়িত্ব আরো সুনির্দিষ্ট করে পরিষদের ম্যানুয়াল নতুন করে তৈরী করতে হবে।

⇒ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অপসারণ করার ক্ষমতা এক ধরণের দুর্বলতা। জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা বন্ধ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করে অপসারণ ক্ষমতা রদ করার কথা উল্লেখ করেন।

⇒ পরিষদ সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ জানা যায় তা সর্বক্ষেত্রে সত্য নয়। পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সচেতনতার অভাব রয়েছে।

⇒ **আমাদের দেশের জন্য কর স্তর বিশিষ্ট্য স্থানীয় সরকার কাঠামো যথার্থ বলে মনে করেন?** এর উত্তরে তারা তিন স্তর বিশিষ্ট্য স্থানীয় সরকার কাঠামো যথার্থ বলে মনে করেন। কারণ গ্রাম সরকার আর্থিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের উপর নির্ভরশীল। ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়ালে এ ধরণের বাড়তি প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ যেখানে অর্থনৈতিক সম্পদের

কারণে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারছে না সেখানে গ্রাম সরকারকে বাড়তি অর্থ কোথা হতে যোগান দিবে। বাড়তি স্তর মানেই বাড়তি খরচ, বাড়তি নতুন কিছু সমস্যা সৃষ্টি। তাই উন্নয়নের স্বার্থেই স্তর সংখ্যা কমাতে হবে।

⇒ পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্য হস্তক্ষেপ করে থাকে। ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য কোন প্রকল্প গ্রহণের প্রয়োজন হলে তার সাথে আলাপ করে ঠিক করতে হয়। এছাড়া সরকারী অনুদান কিভাবে ব্যয় হবে তা তিনি ঠিক করে দেন। অন্যদিকে পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য ভিন্ন দলের হলে সে ক্ষেত্রে অনুদান পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানির স্বীকার হতে হয়। তাদের মতে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে জনগণের ধারণা ভাল না।

⇒ চেয়ারম্যানদ্বয় মনে করে, পরিষদের হাতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড, খাজনা আদায় ও রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্ব দেওয়া হলে পরিষদের আয় বাড়বে। অন্যদিকে সামাজিক অনেক সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারী ক্ষমতা প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ সব নিয়ন্ত্রণ পরিষদের কর্মকান্ড পরিচালনায় বাঁধার সৃষ্টি করে।

⇒ সরকার কেন্দ্র হতে আর্থিক সাহায্য সরাসরি পরিষদের কাছে প্রেরণ করলে পরিষদ স্বাধীনভাবে এলাকার উন্নয়নের যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। সমস্যা বুঝে যে কোন প্রকল্প গ্রহণ করে উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি প্রশাসনের হস্ত ক্ষেপ মুক্ত হয়ে যে কোন সমস্যার দ্রুত সমাধান দেওয়া সম্ভব হবে। অন্যদিকে জনগণের কাছে পরিষদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে।

দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ।

⇒ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সকল নির্বাচিত সদস্যরা জানিয়েছেন নির্বাচনের সময় তারা কোন সমস্যার সম্মূখীন হয়নি।

⇒ পরিষদের সদস্য হিসাবে তারা আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার, স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন, শিক্ষা, রিলিফ বিতরণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সমস্যা সমাধান, পরিবেশ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি দায়িত্ব তারা পালন করেন।

⇒ সকল ওয়ার্ড সদস্য বলেছেন, তিনটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের তাদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করেন।

⇒ **মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকার প্রয়োজন আছে কি?** এ প্রশ্নের উত্তরে সদস্যরা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করে-

সারণী ৪.২০ঃ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সম্পর্কে মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা	উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৫	৫৬	হ্যাঁ	৬	৬৭
না	৪	৪৪	না	৩	৩৩
মোট	৯	১০০	মোট	৯	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৫৬% এবং নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ৬৭% সদস্য মনে করে ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন থাকার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের মতে ইউনিয়নের অর্ধেক ভোটার যেহেতু নারী তাই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা তারা উল্লেখ করেন। অপরদিকে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৪৪ % ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৩৩ % সদস্য মনে করেন তাদের জন্য আসন সংরক্ষণের দরকার নেই। তাদের মতে মহিলারা ইউনিয়ন পরিষদের কাজের জন্য উপযুক্ত নয়।

⇒ **৩টি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হওয়ার কারণে মহিলা সদস্যরা কি কোন প্রভাব খাটাতে চায়?** এ প্রশ্নের জবাবে সদস্যরা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন।

সারণী ৪.২১ঃ সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের প্রভাব সম্পর্কে মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা	উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৫	৫৬	হ্যাঁ	৭	৭৮
না	৪	৪৪	না	২	২২
মোট	৯	১০০	মোট	৯	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের যথাক্রমে ৫৬% ও ৭৮% সদস্য মনে করে তিনটি ওয়ার্ড হতে নির্বাচিত হওয়ার কারণে পরিষদের কাজে প্রভাব খাটাতে চায়। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, যেহেতু তারা তিনটি ওয়ার্ড হতে নির্বাচিত হয়েছে তাই তাদের ধারণা তারা অধিক হারে কাজের দায়িত্ব ও সুযোগ সুবিধার দাবীদার। তবে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা, কারণ তাদের ক্ষমতা সীমিত।

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের ৪৪% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ২২% সদস্যর মতে মহিলা সদস্যরা কোন প্রভাব খাটাতে চায়না।

⇒ **স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন কি দলীয় ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ?** এ প্রসঙ্গে মতামত।

সারণী ৪.২২ঃ স্থানীয় নির্বাচন সম্পর্কে মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা	উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২	২২	হ্যাঁ	১	১১
না	৭	৭৮	না	৮	৮৯
মোট	৯	১০০	মোট	৯	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

এ প্রশ্নের জবাবে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ২ জন ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ১ জন সদস্য মনে করে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ যার শতকরা হার যথাক্রমে ২২% ও ১১%। অপরদিকে দক্ষিনগাঁও ইউনিয়নের ৭ জন ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৮ জন সদস্য মনে করে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ নয় যার শতকরা হার যথাক্রমে ৭৮% ও ৮৯%।

⟹ **মহিলা সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকে কি?** এ প্রশ্নের উত্তরে সদস্যরা নিম্নোক্ত মতামত দেন।

সারণী ৪.২৩ঃ মহিলা সদস্যদের সভায় উপস্থিত প্রসঙ্গে মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা	উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৩	৩৩	হ্যাঁ	২	২২
না	৬	৬৭	না	৭	৭৮
মোট	৯	১০০	মোট	৯	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের ৩৩% সদস্যের মতে মহিলা সদস্যরা সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন, ৬৭% সদস্যর মতে সদস্যরা নিয়মিত উপস্থিত থাকে না। অপর দিকে নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ২ জন সদস্যর মতে সদস্যরা নিয়মিত উপস্থিত থাকেন, ৭ জন সদস্যের মতে পরিষদের সভায় মহিলা সদস্যরা নিয়মিত উপস্থিত থাকেনা, যার শতকরা হার যথাক্রমে ২২% ও ৭৮%।

⟹ সকল সদস্যর মতে কাজ করার সময় মহিলা সদস্যরা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেনা। তবে সভা রাতে হলে কিছুটা নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে।

⟹ **আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য?** এ প্রশ্নের জবাবে সদস্যদের মতামত-

সারণী ৪.২৪ঃ রাজনৈতিক দলের সদস্য প্রসঙ্গে মতামত

দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন			নাসিরাবাদ ইউনিয়ন		
উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা	উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৭	৭৮	হ্যাঁ	৬	৬৭
না	২	২২	না	৩	৩৩
মোট	৯	১০০	মোট	৯	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের ৭৮% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ৬৭% সদস্য কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য। অন্যদিকে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ২২% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের ৩৩% সদস্য কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য নয়।

⇒ সকল সদস্য মনে করেন জাতীয় নির্বাচনের মত স্থানীয় সরকারের নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন হওয়া উচিৎ নয়।

⇒ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নে পরিষদের সকল সদস্য মনে করেন, পরিষদ সংক্রান্ত সরকার গৃহীত পদক্ষেপ সঠিক নয়। তারা মনে করেন পরিষদকে কার্যকরী করতে হলে একে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। সরকার ও প্রশাসনের হস্ত ক্ষেপ মুক্ত হলেই পরিষদ অনেক ভালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে।

⇒ সকল সদস্যই মনে করেন যে সব আইনের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হয় বর্তমানে তা আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। তারা মনে করে পরিষদের সকল আইন সুনির্দিষ্ট হওয়া সরকার। পরিষদের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে বন্টন করে পরিষদ বর্তমানে যে ম্যানুয়াল অনুযায়ী চলছে তা হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

⇒ দুটো ইউনিয়নের সকল ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য জানিয়েছেন পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্য হস্তক্ষেপ করে। তারা ইউনিয়নের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে না। সকল প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে স্থানীয় সংসদ সদস্যর সাথে আলোচনা করে ঠিক করতে হয়। তার ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

⇒ **সরকার কেন্দ্র হতে সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করলে সুবিধা হবে কি?** এই প্রশ্নের উত্তরে সকল সদস্য জানিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি অর্থ বরাদ্দের ফলে পরিষদ ইচ্ছে মতো যে কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে। বর্তমানে সদস্যরা প্রশাসনিক যে সব জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন তা থেকে তারা রক্ষা পাবে। অন্যদিকে পরিষদ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে দূর্নীতি অনেকাংশে কমে যাবে এবং গ্রামের উন্নয়ন দ্রুততর হবে।

⇒ সকল সদস্য মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে হলে সরকার ও প্রশাসনের হস্তক্ষেপ মুক্ত করে এর পরিচালনার ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।

⇒ তাদের মতে, ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান সংকটের মূলে কেন্দ্রীয় সরকারের অতি নিয়ন্ত্রণ, আমলাতান্ত্রিক বিধি ও নিয়মাবলী, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সীমিত পরিমাণ অর্থের বরাদ্দকরণ, প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব, ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া, এমপিদের হস্তক্ষেপ, ভাতার স্বল্পতার কথা উল্লেখ করেন।

⇒ সদস্যদের মতে, পরিষদের আয় বৃদ্ধির জন্য হাট-বাজার, খেয়াঘাট, জলমহাল, জমির ইজারা হতে প্রাপ্ত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের ফান্ডে জমা দেওয়ার কথা বলেছেন। এছাড়া সরকার যে সব অর্থের উৎস ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন তা পুনরায় ফেরৎ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

⇒ বর্তমানে যে পরিমান মাসিক ভাতা পরিষদের সদস্যদের দেওয়া হয় তাতে সদস্যরা সন্তুষ্ট নয়। তারা মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করার কথা বলেন।

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ।

নির্বাচন সংক্রান্তঃ

⇒ নির্বাচনের পূর্বে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে সদস্যরা নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন।

সারণী ৪.২৫ঃ নির্বাচনের পুর্বে রাজনীতি অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে মতামত

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৪	৬৭
না	২	৩৩
মোট	৬	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় ৬৭% মহিলা সদস্য নির্বাচনের পূর্বে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, ৩৩% সদস্য জানিয়েছেন তারা রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন না। তবে সকল নির্বাচিত সদস্য নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন।

⇒ **নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কে বেশী উৎসাহ দিয়েছে?** এ প্রসঙ্গে সদস্যরা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন।

সারণী ৪.২৬ঃ নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে মতামত

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
স্বামী	৪	৬৭
আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী	২	৩৩
মোট	৬	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

এ প্রশ্নের উত্তরে ৪ জন মহিলা সদস্য জানিয়েছেন তাদের স্বামী নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহ দিয়েছে যাদের শতকরা হার ৬৭%। ২ জন সদস্য জানিয়েছেন আত্মীয় স্বজন তাদের সবচেয়ে বেশী উৎসাহ দিয়েছেন যাদের শতকরা হার ৩৩%। এছাড়া সদস্যরা শ্বশুর বাড়ীর লোকজন, বন্ধুবান্ধবের কথাও উল্লেখ করেন।

⟹ সকল সদস্যই জানিয়েছেন তারা নির্বাচনকালীন সময় বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হয়েছেন। তারা পারিবারিক ও সামাজিক বাধার কথা বলেন। পাশাপাশি নিরাপত্তার অভাব, প্রয়োজনীয় সাহায্যর অভাব, অর্থের অভাব ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন।

⟹ নির্বাচনে জয়ী হবার কারণ সম্পর্কে সদস্যরা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন।

সারণী ৪.২৭ঃ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে মতামত

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা
পূর্ব পরিচিতি	৫	৮৩
পারিবারিক পরিচিতি	১	১৭
মোট	৬	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় ৮৩% উত্তরদাতা মনে করে এলাকায় তাদের পূর্ব পরিচিতি তাদের জয়ী হওয়ার কারণ বলে মনে করেন। ১৭% উত্তরদাতার মতে পারিবারিক পরিচিতি তাকে জয়ী হতে সাহায্য করেছে।

⟹ নির্বাচনের পূর্বে সদস্যরা এলাকাবাসীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো পরবর্তীতে তা তারা পূরণ করতে পারেন নি। এ জন্য তারা প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, প্রয়োজনীয় সাহায্য অল্প পাওয়া, বন্টন সমস্যা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন।

রাজনীতি সম্পর্কে ঃ

⟹ মহিলা সদস্যরা রাজনীতিতে আসার কারণ হিসেবে এলাকার উন্নয়ন করার কথা উল্লেখ করেন। তাদের মতে, গ্রামের সাধারণ জনগণ হয়ে এলাকার উন্নয়ন করা সম্ভব নয়, তাই জনগণের প্রতিনিধি হয়ে জনগণের সেবা করা তাদের লক্ষ্যে।

⟹ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রধান প্রতিবন্ধক বলে তারা মনে করেন।

⟹ **রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনার পরিবার সহযোগিতা করে কি?** এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়।

সারণী ৪.২৮ঃ পরিবারের সহযোগিতা প্রসঙ্গে মতামত

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
সহযোগীতা করে	৪	৬৭
খুব বেশী নয়	২	৩৩
মোট	৬	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় ৪ জন সদস্যকে তাদের পরিবারের সদস্যরা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা করে যাদের শতকরা হার ৬৭%। অপরদিকে ২ জন সদস্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায়না পরিবারের কাছ থেকে যাদের শতকরা হার ৩৩%।

দায়িত্ব সম্পর্কেঃ

⟹ **ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসাবে আপনি কি কি দায়িত্ব পালন করেন?** এ প্রশ্নের জবাবে মহিলা সদস্যরা বলেছেন রিলিফ সামগ্রী বিতরণ, বয়স্ক ভাতা, ভিজি এফ কার্ড বিতরণ ও গ্রামের ছোটখাটো বিচার মীমাংসার কথা উল্লেখ করেছেন। এ দায়িত্বের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা শিক্ষা, টিকাদান কর্মসূচী হস্তশিল্প ইত্যাদি কমিটির তারা অন্তর্ভূক্ত হয়ে থাকেন।

সমস্যা সম্পর্কেঃ

⟹ সদস্যরা জানিয়েছেন পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতা, বিভিন্ন নেতিবাচক মন্তব্য, সভায় নোটিশ না পাওয়া, কমিটিতে নাম থাকা সত্ত্বেও ডাক না পাওয়া ইত্যাদি সমস্যার মুখোমুখি তারা হয়ে থাকেন। এ ছাড়া কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন। অনেক সময় তারা পুরুষ সদস্য ও গ্রামের টাউট শ্রেণীর দ্বারা বিরূপ আচরণ পেয়ে থাকেনা। অন্যদিকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তারা কাজ করার তেমন সুযোগ পাচ্ছেনা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যগুলি সাধারণতঃ পুরুষ সদস্যরাই করছেন।

⟹ **ইউপির মহিলা সদস্য হিসাবে এলাকার মানুষ আপনাকে কিভাবে মূল্যায়ন করছে?** এ প্রশ্নের উত্তরে মহিলা সদস্যদের মতামত।

সারণী ৪.২৯ঃ মহিলা সদস্যদের মুল্যায়ন প্রসঙ্গে মতামত

উত্তরের ধরণ	গণসংখ্যা	শতকরা
কাজে উৎসাহ দেয়	২	৩৩
ভালো চোখে দেখছেনা	৪	৬৭
মোট	৬	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় ২ জন সদস্যকে এলাকার মানুষ উৎসাহ দেয় যাদের শতকরা হার ৩৩%। ৪ জন সদস্য জানিয়েছেন বর্তমানে এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ না করাতে এলাকাবাসী তাদের ভালো চোখে দেখছে না, যাদের শতকরা হার ৬৭%।

⇒ **চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যগণ কি আপনাকে কাজ করার সুযোগ দেয়?** এ প্রসঙ্গে সদস্যরা ম্নিাক্ত মতামত প্রদান করেন।

সারণী ৪.৩০ঃ মহিলা সদস্যদের কাজের সুযোগ প্রসঙ্গে মতামত

উত্তরের ধরণ	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২	৩৩
না	৪	৬৭
মোট	৬	১০০

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরেব সারণীতে দেখা যায় দুইজন সদস্যকে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যগণ কাজ করার সযোগ দেয় যার শতকরা হার ৩৩%। ৪ জন সদস্য জানিয়েছেন সদস্যরা তাদের কাজ করার সুযোগ দেয় না, যার শতকরা হার ৬৭%।

⇒ মহিলা সদস্যরা তাদের কাজের পৃথক তালিকা প্রণয়নের কথা বলেছেন। তালিকা প্রণয়ন হলে তারা সব ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অন্যদিকে পুরুষ সদস্য ও মহিলা সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে যে বৈষম্যে রয়েছে তা দূর হবে।

⇒ সকল নারী সদস্যই আসন বন্টন কাঠামো সমর্থন করেননি। সদস্যদের মতে একজন সাধারণ সদস্য যেখানে একটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয় সেখানে একজন নারী সদস্য তিনটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন। স্বাভাবিকভাবেই নারী আসনের ভোটার সংখ্যা সাধারণ আসনের তিন গুণ। কিন্তু সাধারণ আসন ও নারী আসনের

জন্য সম্পদ বন্টন হয় সমহারে। একজন সদস্য সাধারণ আসনের কাজে যে সম্পদ ব্যয় করেন সমান পরিমাণ সম্পদ দিয়ে একজন নারীকে তিনগুন ভোটারের জন্য কাজ করতে বলা হয় যা সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

⇒ **ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা কি উচিৎ?** এ প্রশ্নের উত্তরে সকল মহিলা সদস্যাই আসন বৃদ্ধির কথা বলেছেন। মহিলা সদস্যর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পুরুষ সদস্যদের সাথে সমতা আসবে বলে তারা উল্লেখ করেন।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের সভা মাসে একবার হয়। প্রতিটি সভায় নারী সদস্যরা উপস্থিত থাকেন। তবে সভা রাতে হলে কিছু সদস্য সভায় যোগদান হতে বিরত থাকেন।

⇒ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যরা তেমন সুযোগ পায় না বলে জানিয়েছেন। কাঠামোগত ভাবে ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্য সংখ্যায় কম হওয়াতে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা পরিষদের কাজ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ভাবে বাধা দানের চেষ্টা করেন।

⇒ সালিশ বিচারে সাধারণতঃ তারা অংশগ্রহণ করেন না, কারণ তাদের উপস্থিত থাকতে বলা হয় না। ক্ষেত্র বিশেষ তাদের উপস্থিত থাকতে বলা হলেও সন্ধ্যার পর সালিশ হওয়াতে তারা উপস্থিত হতে পারে না। এছাড়া সালিশের রায় সাধারণতঃ পুরুষ সদস্যরাই দিয়ে থাকেন। তারা রায় প্রদানে তেমন সুযোগ পান না।

⇒ পরিষদ সদস্যদের যে সম্মানী প্রদান করা হয় তাতে তারা সন্তুষ্ট নয়। তাদের মতে সদস্যদের মাসিক ভাতা ৩০০০ টাকা ও চেয়ারম্যানদের ভাতা ৫০০০ টাকা হওয়া উচিৎ।

⇒ ১৯৯৮ সালের পর বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে নারী সদস্যদের ভূমিকা স্পষ্ট করা হলেও তাদের হাতে এ সংক্রান্ত কোন সার্কুলার কপি এসে পৌছেনি। পরিষদ অফিসেও এ সংক্রান্ত কোন সার্কুলার কপি নেই। এজন্য মহিলা সদস্যরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয় এবং এ সম্পর্কে তাদের ধারণা অস্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

৫ম অধ্যায়
২০০৩ নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী দায়িত্ব

ইউনিয়ন পরিষদ দেশের অন্যান্য স্থানীয় সরকার কাঠামোগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। ১৯৭৪ সালে স্থানীয় সবকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে এ প্রতিষ্ঠান একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। আইন, প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থাপনা, সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও এ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা সন্দেহাতীতভাবে সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে এটিই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে নিয়মিত নির্বাচন হয়ে আসছে।

দেশে ছয়টি ইউপি নির্বাচনের পর ২০০৩ সনের জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ ৫১ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে সপ্তম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন (আহমেদ, ২০০৩: ৫) এ নির্বাচন দেশে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন ও গণতন্ত্র সুসংহতকরণে এবং দেশের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি উজ্জল করতে অনেক খানি সহায়ক ভূমিকা পারল করবে।

দেশের মোট ৪৪৯৬ টি ইউনিয়নের মধ্যে ২০০৩ অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৪২২৩ টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৬ কোটি ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার ৮০৬ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিল ৩ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ১০৮ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ ৭১ হাজার। এ নির্বাচনে সংরক্ষিত নারী আসন মোট ১৩ হাজার। এ লক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ৩৯ হাজার ৪১৯ জন নারী প্রার্থী এবং বিজয়ী হয়েছেন ১২৬৮৪ জন। এছাড়া চেয়ারম্যান পদে এবার অনেক নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে পুরুষের সঙ্গে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে, এটা অবশ্যই ইতিবাচক পদক্ষেপ (আশরাফ ২০০৩:৪)। এবার এ নির্বাচনের মাধ্যমে আরো একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। আর তা হলো। আমাদের সমাজের প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা এবারের নির্বাচনে সরাসরি প্রদ্বিন্দ্বিতা করেছেন। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা যেমন অংশগ্রহণ করেছেন, সমাজের মানুষও তেমনি তাদেরকে এই অংশগ্রহনে উৎসাহিত করেছেন সচেতনতার মাধ্যমে ভোট দিয়ে।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ২০০৩ ও আচরণ বিধিমালা ঃ ২৫ জানুয়ারি থেকে ১৬ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত সারা দেশে ৭ম ইউনিয়ন পরিষদের নিবৃাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন উপলক্ষে প্রথমবারের মতো নির্বাচন আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করেছে (কালাম, ২০০৩ঃ৫)।

নির্বাচন আচরণ বিধিমালা

১। **নির্দলীয় নির্বাচনঃ** ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন রাজনৈতিক দলভিত্তিক নয় এবং নির্বাচনী প্রচারণায় কোন রাজনৈতিক দলের নাম, প্রতীক অথবা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম বা ছবি ব্যবহার করা যাবে না।

২। **প্রতিষ্ঠানের চাঁদা, অনুদান প্রদান ইত্যাদি নিষিদ্ধঃ** নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী কর্তৃক কিংবা তার পক্ষ থেকে অন্য কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করবেন না।

৩। **সরকারি সার্কিট হাউস, ডাকবাংলো, রেস্টহাউজ ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধঃ** কোনো প্রার্থী নির্বাচন পূর্ব সময়ে সরকারি ডাকবাংলো, রেস্টহাউস বা সার্কিট হাউসে অবস্থান করতে পারবেন না।

৪। **নির্বাচনী প্রচারণাঃ** নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী এবং তার পক্ষে প্রচারণায় অংশগ্রহনকারী অন্যান্য ব্যক্তি নিম্নবর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করবেন।

ক. প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার থাকবে, প্রতিপক্ষের কোনো সভা, মিছিল এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান বন্ধ করা বা তাতে কোনোপ্রকার বাধা প্রদান করা যাবে না।

খ. কোনো প্রার্থীর পক্ষে আয়োজিত জনসভা বা মিছিলের দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

গ. পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত জনগণের জন্য ব্যবহার্য কোনো সড়কে কোনো জনসভা করা যাবে না।

ঘ. কোনো সভা সমাবেশ বা মিছিলে বাধাদানকারী বা অন্য কোনোভাবে ঘোগযোগ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রার্থী বা অন্য কোনো ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শরণাপন্ন হতে পারবেন না।

ঙ. নির্বাচন পূর্ব সময়ে কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কেউ নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচার যন্ত্র, সরকারী কর্তমকর্তা-কর্মচারী বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার অথবা অন্য কোনো প্রকার সরকারি সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

চ. নির্বাচনী প্রচারের উদ্দেশ্য কোনো তোরণ বা গেট নির্মান, আলোকসজ্জা অথবা জাঁকজমকপূর্ণ প্রচারণা করা যাবে না।

ছ. কোন প্রার্থীর পোস্টার লিফলেট ও হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না। এবং উক্ত পোস্টার লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের কোনো ক্ষতিসাধন তথা বিকৃত বা বিনষ্ট করা যাবে না।

জ.	কোনো চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত আসনের সদস্য ও সংরক্ষিত আসন ব্যতীত সদস্য প্রার্থীর জন্য যথাক্রমে নয়টি, ছয়টি ও তিনটির অধিক নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না এবং কোনো সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না।

ঝ.	সরকারি ডাকবাংলো, রেস্ট হাউস, সার্কিট হাউস অথবা কোনো সরকারি কার্যালয়কে কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ঞ.	নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার্য পোস্টার দেশে তৈরি কাগজে সাদা কালো রংয়ের হতে হবে এবং এর আয়তন কোনো অবস্থাতেই ২৩" X ১৮" - এর অধিক হতে পারবে না।

ট.	কোনো প্রার্থী একই সঙ্গে একটি ওয়ার্ডে একটির বেশি মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না এবং উক্ত মাইক বা শব্দের মাত্রা হবে বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২-৩০টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

ঠ.	কোনো কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে কোনো দেয়াল, দালান, থাম, বাড়িঘরের ছাদ, সেতু, যানবাহন বা অন্য কোনো স্থানে প্রচারমূলক কোনো লিখন বা অঙ্কন করা যাবে না।

ড.	ট্রাক, বাস মোটরসাইকেল কিংবা অন্য কোনো যানবাহন সহকারে মিছিল কিংবা মশাল মিছিল বের করা যাবে না।

ঢ.	কোনো প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণাকালে কোনো প্রকার উষ্কানিমূলক বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করতে পারবেন না।

৫.	**সম্পত্তির ক্ষতিসাধন ও শক্তি নিষিদ্ধঃ** নির্বাচন উপলক্ষে কোনো নাগরিকের জমি, ভবন বা অন্য কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির কোনোরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না এবং গোলযোগ বা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দ্বারা কারো শান্তিভঙ্গ করা যাবে না।

৬.	**যান্ত্রিক যানবাহন চালানো ও অস্ত্র ইত্যাদি নিষিদ্ধঃ** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে বা নির্ধারিত স্থানের মধ্যে মোটরসাইকেল বা অন্য কোন যান্ত্রিক যানবাহন চালাবেন না এবং Arms Act. 1878. এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত অর্থে Firearms বা অন্য কোন arms বহন করবেন না।

৭.	**নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখাঃ** কোনো ব্যক্তি অর্থ, অস্ত্র, পেশিশক্তি স্থানীয় প্রভাব বা সরকারি ক্ষমতার দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করবেন না।

৮.	**ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার ঃ** ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট পোলিং এজেন্ট ভোটার এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতিরকে অন্য কেউ ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবেন না।

৯.	কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করলে তা Union Parishad (Election) Rules 19\83- এর Rule, 5-3 মোতাবেক বেআইনি আচরণ হিসাবে গণ্য হবে।

দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনঃ

২০০৩ ইউনিয়ন পরিষধ নির্বাচনে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নে মোট ভোটার ছিল ২৩,১৯৯ এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিলো ১২,৫০৯ এবং মহিলা ভোটার ছিল ১০,৬৯০ জন। অপরদিকে নাসিরবাদ ইউনিয়নে মোট ভোটার ছিল ৯০৭৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৭১১ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,২৮৪ জন।

সারণী ৫.১ ঃ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনী ফলাফল (২০০৩)

জেলার নাম	থানার নাম	ইউনিয়নের নাম	প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা (%)	বাতিল ভোটের (%) হার			প্রার্থীর সংখ্যা (জামানত বাজেয়াপ্তের সংখ্যা)		
				চেয়ারম্যান	সংরক্ষিত	সাধারণ	চেয়ারম্যান	সংরক্ষিত	সাধারণ
ঢাকা	সবুজ বাগ	দক্ষিণগাঁও	৫৬.৬৬	৩.০৪	৩.০৪	৩.৯৭	৪ জন	২ জন	১৪জন
	খিলগাঁও	নাসিরাবাদ	৯১.১২	১.৬৫	১.৬৫	২.৬৬	৪ জন	১ জন	৬জন

উৎসঃ জেলা নির্বাচন অফিসার- ২,ঢাকা এর কার্যালয়।

উপরের সারণীতে দেখা যায় ২০০৩ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দক্ষিণগাঁও ইউণিয়নে ভোট প্রদান করা হয়েছে ৫৬.৬৬% এবং বাতিল ভোটের হার যথাক্রমে চেয়ারম্যান ৩.০০%, সংরক্ষিত আসনে ৩.০৪ % ও সাধারণ আসনে ৩.৯৭%। অপরদিকে নাসিরাবাদ ইউনিয়নে মোট ভোট কাস্ট হয়েছে ৯১.১২% এবং বাতিল ভোটের হার যথাক্রমে চেয়ারম্যান ১.৬৫%, সংরক্ষিত আসনে ১.৬৫% ও সাধারণ আসনে ২.৬৫%।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন, কাঠামো, কার্যাবলী মূলত, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এরই পরিবর্তিত রূপ। এবং এই পরিবর্তন অনুযায়ী ২০০৩ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয়েছে। ১৯৯৩ ও ১৯৯৭ সালে পূর্ববর্তী ১৯৮৩ অধ্যাদেশের কিছু সংশোধন করে একে যুগোপযোগী করা হয়। নিম্নে ১৯৮৩, ১৯৯৩ এব ১৯৯৭ সালে পরিবর্তিত অধ্যাদেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুলে ধরা হল।

ক. ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ এর ৫ নং ধারায় প্রতিটি ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে ভাগ করে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিনজন করে মোট নয় জন সদস্য সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এবং মহিলাদের প্রতি ওয়ার্ড হতে একজন করে মোট তিন জনকে মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত করার বিধান ছিল। ১৯৯৩ সালের সংশোধনী আইন ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মহিলাদের জন্য তিনটি আসন সংরক্ষিত থাকবে। এবং তারা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দ্বারা ভোটে নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসনের জন্য নির্বাচিত হবেন। ১৯৯৭ সালের অধ্যাদেশ আইনের ৫ নং ধারা অনু-১ বলা হয়েছে যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ একজন চেয়ারম্যান এবং সংরক্ষিত আসনে ৩ জন মহিলা সদস্যসহ বার জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। সংশোধনী আইনের ৫ নং ধারায় ৩নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসন থাকবে এবং তারা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে। এছাড়া সাধারণ আসনে মহিলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।

খ. ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশ এবং ১৯৯৩ সালের অধ্যাদেশ আইনের ৩০, ৩১, ৩২, ৩২, ৩৩ ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের কাজকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) নাগরিক কার্যাবলী (২) রাজস্ব ও প্রশাসন (৩) নিরাপত্তা (৪) উন্নয়ন।

গ. ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশের ৩৮ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন কমিটি বা সাব কমিটি গঠন করতে পারে এবং কমিটি বা সাব-কমিটি যে কাজই করবে যা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে। ১৯৯৩ সালের অধ্যাদেশ আইনে ৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। যথা (১) অর্থ ও সংস্থাপন (২) শিক্ষা (৩) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ এবং পয়ঃপ্রণালী (৪) নিরীক্ষা ও হিসাব (৫) কৃষি ও অন্যান্য উন্নয়ন মূলক কাজ (৬) সমাজ কল্যান ও কমিউনিটি সেন্টার (৭) কুটির শিল্প ও সমবায়।

সংশোধনী আইনের ৪৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং ইউনিয়ন তহবিল নামে পরিচিত হবে। ইউনিয়ন তহবিলে নিম্নোক্ত অর্থ জমা রাখা হবে।

ক. অত্র অধ্যাদেশ কার্যকর হবার তারিখ পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলের অবশিষ্ট অর্থ।

খ. অত্র অধ্যাদেশের অধীনে সকাল কর ফি ও আদায়কৃত অন্যান্য অর্থ।

গ. ইউনিয়ন পরিষদের উপর ন্যস্ত অথবা এর দ্বারা পরিচালিত সম্পত্তির ভাড়া ও মুনাফা।

ঘ. অত্র অধ্যাদেশের অথবা সমকালে প্রচলিত দেশের অন্য যে কোন আইনে সম্পাদিত কাজের ফলে প্রাপ্ত অর্থ।

ঙ. কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে চাঁদা হিসাবে প্রাপ্ত যাবতীয় অর্থ।

চ. ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনার ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত অর্থ।

ছ. সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সকল অনুদান।

জ. সরকার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের এখতিয়ারে ন্যস্ত অন্যান্য সূত্র হতে উপার্জিত অর্থ।

৫. সংশোধনী আইনের ৪৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, ইউনিয়ন তহবিলের সকল টাকা কড়ি কোন সরকারী ট্রেজারিতে অথবা কাজকর্ম সম্পাদন করে এরূপ ব্যাংকে অথবা সময়ে সময়ে নির্দেশিত অন্য কোন পন্থায় জমা রাখতে হবে।

৬. অধ্যাদেশ আইনের ৪৫ নং ধারায় ইউনিয়ন তহবিলের অর্থ নিম্নোক্ত পন্থায় ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে।

ক. ইউনিয়ন পরিষদের অফিসার ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা পরিশোধ।

খ. অত্র অধ্যাদেশের অধীনে ইউনিয়ন তহবিলের উপর ধার্যকৃত ব্যয় নির্বাহ।

গ. অত্র অধ্যাদেশের অধীনে সমকালে প্রচলিত দেশের আইনের অধীনে ইউনিয়ন পরিষদের উপর আরোপিত অন্য কোন দায় দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যয় নিবাহ।

ঘ. বিলুপ্ত উপজেলা পরিষদ অথবা থানা পরিষদের পুর্বেকার মঞ্জুরীকৃত ব্যয়, যা ইউনিয়ন তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় বলে গন্য হবে।

ঙ. সরকার কর্তৃক ইউনিয়ন পরিষদের উপর আরোপিত ব্যয়।

৭. সংশোধিত আইনের ৪৭ নং ধারার বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি অর্থ বছর আরম্ভের পুর্বে নির্ধারিত পন্থায় উক্ত বছরের জন্য আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের বিবরণ প্রণয়ন করবে যা অতঃপর বাজেট নামে অভিহিত হবে এবং অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসনের নিকট পাঠাবে।

৮. অধ্যাদেশ আইনের ৪৮ নং ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব নির্ধারিত পন্থায় ও পদ্ধতি অনুসারে সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে।

৯. সংশোধনী আইনের ৪৯ নং ধারায় প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব নির্ধারিত পন্থায় নির্দিষ্ট বিরতিতে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. অধ্যাদেশ আইনের ৫১ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার যেমন প্রয়োজন মনে করবেন সে অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ নির্ধারিত মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

১১. ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশের দ্বিতীয় তফসিলে ইউনিয়ন পরিষদকে ৫টি বিষয়ের উপর করারোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৩ সালে অধ্যাদেশের ৫৭ নং ধারায় ৬টি বিষয়ের উপর করারোপের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো।

ক. ঘর বাড়ী এর বার্ষিক মূল্য এর উপর কর।

খ. পেশা, ব্যবসা এবং কলিং এর উপরকর।

গ. সিনেমা, নাটক ও থিয়েটার প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আপ্যায়ন এবং এ ধরনের প্রমোদ কর।

ঘ. পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত লাইসেন্স এবং পারমিটের জন্য ফি।

ঙ. সম্পুর্ণ রূপে ইউনিয়নের সীমানার মধ্যে অবস্থিত এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জলমহাল হতে ফি।

নির্বাচন পরবর্তী দায়িত্ব ঃ ইউনিয়ন পরিষদের ওপর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও কমিউনিটি উন্নয়নের ব্যাপক দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের ৩০(২) ধারায় ইউনিয়ন পরিষদের উপর দশটি বাধ্যতামূলক কাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাহলোঃ আইন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে সহায়তা প্রদান ও বিরোধ নিষ্পত্তিসহ আইন শৃংখলা বজায় রাখা, বিশৃংখলা ও চোরাচালান প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে কৃষি, বন, মৎস পশুসম্পদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটির শিল্প, যোগাযোগ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্কিম বাস্তবায়ন, স্থানীয় সম্পদের উৎপাদন ও তার ব্যবহার, ইউনিয়নে বিভিন্ন সংস্থার (সরকারী ও আধাসরকারী) নেয়া উন্নয়ন কর্মকান্ড পর্যালোচনা, রাস্তা, সেতু, খাল, বাঁধ, হাট বাজার এবং টেলিফোন ও বিদ্যুৎ লাইনের মতো সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, সব ধরনের শুমারী পরিচালনা করা এবং জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, অন্ধলোক, ভিক্ষুক ও দুস্থদের নিবন্ধীকরণ (আমিনুজ্জামান, ২০০৪ঃ২৫)। অধ্যাদেশ আইনের ধারাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এবং ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজ পরিষদের নামে পরিচালিত হয়। তার পরও পরিষদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। এর মূল কারণ হলো পরিষদকে যে ধরনের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এগুলোর অনেকগুলোই ইউনিয়ন পরিষদের আইনগত কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে পরে না। অপরদিকে স্থানীয় সরকার হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ নীতি সংক্রান্ত ও পদক্ষেপ গ্রহণের কোন কর্তৃত্ব নেই। কারণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কোন গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। পরিষদের কার্যাবলী সুষ্ঠু ভাবে করা জন্য ৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের কথা বলা হলেও প্রয়োজনে

অতিরিক্ত কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে পরিষদকে কার্যকরী করে তুলতে হলে ৭টি স্ট্যান্ডিং কমিটির স্থলে অল্প সংখ্যক কমিটি গঠনের বিধান করে কর্মক্ষম করে তোরা দরকার।

আমরা জানি একটি ইউনিয়নের সকল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নেই কিন্তু এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যা স্থানীয় উদ্যোগে মোকাবেলা করা সম্ভব। যেমন শিশুর জন্ম নিবন্ধন, বাল্যবিবাহ নিরোধ, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন। এর জন্য প্রয়োজন তৃণমূলে জনগণকে সংগঠিত করে তাদেরকে নেতৃত্ব দান (লাহিড়ী, ২০০৩:৭) আর সম্মিলিতভাবে এসব সমস্যা সমাধানে নেতৃত্বের ভুমিকা পালন করতে পারে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত যোগ্য সদস্যরা। তাই স্থানীয় কতগুলো সুনির্দিষ্ট ইস্যুতে প্রার্থীরা কী করবেন সে প্রতিশ্রুতিকে যোগ্যতার মানদন্ড বা মাপকাঠি করা দরকার। বর্তমানে শিশুর জন্মনিবন্ধন, বাল্যবিবাহ রোধ, বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন, নারী নির্যাতন, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত সহ স্থানীয় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও সামাজিক কমিটিগুলোকে দায়িত্বশীল করে তোলা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে প্রধান ইস্যু। এই ইস্যুগুলো আমাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে ব্যহত করছে। সেজন্য এসব ইসুতে প্রার্থীদের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার হওয়া উচিৎ।

একটি সভ্য সমাজের অগ্রগতির জন্য নারী নির্যাতন অন্যতম প্রতিবন্ধক। আর এই প্রয়োজন নারী নির্যাতনের চির অবসান। নারীকে পুরুষের চেয়ে ছোট করে দেখার মানসিকতা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে তাই সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহন ছাড়া শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে স্থানীয় শাসন প্রক্রিয়ায় পুরুষের প্রাধান্য এর ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে নারীরা বাদ পড়ে যায় অন্যদিকে তেমনি পরিসেবা প্রাপ্তি থেকে নারীরা বঞ্চিত হয়। স্থানীয় শাসন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে তাই নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সীমিত এই উদ্যোগের ফলে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। তাই এ ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উন্নয়ন কর্মকান্ডের চাকাকে এগিয়ে নেবার জন্য নারীর সুপ্ত বা অব্যাহত সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।

নির্বাচন আমাদের দেশে সবসময়ই একটি আনন্দ উৎসবের বিষয়। নির্বাচনী হাওয়ার একটা মাদকগুন রয়েছে। এই মাদকগুনে বা দোষে মানুষ ঐ সময়ের মধ্যে অন্যসব প্রসঙ্গ ভুলে যায়। প্রার্থীগণ খরচের তাল সামলাতে জমিজমা এবং ঘরের টিন পর্যন্ত বিক্রি করেছেন এমন প্রমান রয়েছে। নির্বাচন এক সময় শেষ হয়। কিন্তু প্রতিবারের মত নির্বাচনের ফলাফল কি শুধুই কিছু প্রার্থীর জয় লাভ এবং কিছু প্রার্থী পরাজয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে? এখানেই যত বিপত্তি ও অবহেলা। তাই নির্বাচিত পরিষদ সমূহকে কার্যকর করার জন্য এখনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সামগ্রিকভাবে সরকারকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে (আহমেদ, ২০০৩:৫)। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বরাদ্দকৃত অর্থে অপচয় এবং বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ

ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতি রোধের কার্যকর ব্যবস্থা চালু করতে হবে। একইভাবে স্থানীয় পরিষদ এলাকায় যেসব সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরাসরি সরকারী অর্থ খরচ করা হয় তাদের কাজকর্মের নজরদারীর ক্ষমতা স্থানীয় পরিষদের হাতে দিতে হবে। এ ভাবে হয়ত জরুরীভাবে করণীয় কার্য তালিকাকে আরও দীর্ঘ কথা যায়। তবে অন্ততঃ প্রাথমিকভাবে এসব কাজ সমাধান না করে শুধুমাত্র নির্বাচন করে কখনও কার্যকর ও অর্থবহ ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে কোন অবদান রাখতে পারবে না। তাই পরিষদকে কার্যকর করতে হলে নির্বাচনের সাথে মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও এজেন্সীগুলোর উপরোক্ত বিষয় সমূহের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের দেশের স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলি ক্ষমতাসীন সরকারের ইচ্ছার উপরই হয়ে থাকে। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ কেবল নির্দিষ্টভাবে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানেই নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দিয়েছে। স্থানীয় সরকারের সকল নির্বাচন এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নের এখতিয়ার সরকারের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। গত ৩০ বছরের বিভিন্ন পর্বে নির্বাচন কমিশন কেবল এর কুফলই প্রত্যক্ষ করছে (খান, ২০০২:৪)। বাংলাদেশ সংবিধানে ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদ যোগ করেপৃথিবীর অন্যান্য সংবিধান থেকে আমরা অন্যান্য অবস্থানে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু সংবিধান প্রণেতারা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি। স্বাধীন ইউনিটারী রাষ্ট্র বাংলাদেশ যেখানে 'প্রশাসনিক একাংশ' সৃষ্টির মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গণতন্ত্রের চর্চা করতে চেয়েছে যেখানে সরকারের গোঠা নির্বাচন প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন সরকারের খেয়াল খুশির ওপরই নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে।

নির্বাচন হওয়াই বড় কথা নয়, নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের একটি স্তর হিসেবে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারল কিনা সেটাই বড় কথা। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই এখনকার ইউনিয়ন পরিষদ সেই কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না (জাহাঙ্গীর, ২০০৩:৫) নির্বাচনের পাশাপাশি এখন রাজনৈতিক দল নাগরিক সমাজ। এনজিও ও আগ্রহী সবার উচিত কার্যকর ইউণিয়ন পরিষদ গঠনের আন্দোলন গড়ে তোলা। স্থানীয় সরকারের এই স্তর পরীক্ষিত স্তর। জনপ্রিয়ও বটে। এখানে দীর্ঘদিন ধরে কাজ হচ্ছে। কাজেই এই স্তর আরও সমৃদ্ধ করতে পারলে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়নের ধারাটি শক্ত হতে পারে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

স্থানীয় সরকার বিষয়ে গণমাধ্যমের (সংবাদপত্র) ভূমিকা

গণমাধ্যম আমাদের কালের সবচেয়ে বড় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি। সমাজবিজ্ঞানী এ্যান্টনি গিডেন্সের মতে আমরা এখন একটি বিশ্বজোড়া সামগ্রীক তথ্য ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি। গণমাধ্যম আমাদের জীবন ও চিন্তাকে প্রভাবিত করছে নানাভাবে। ফলে তৃতীয় বিশ্বে গণমাধ্যমের প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণ তৈরী হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গণমাধ্যম উন্নয়নের বড় হাতিয়ার।

সাধারণতঃ গণমাধ্যম বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় যার মাধ্যমে জনগণের আশা আকাঙ্খা ও মতামতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাপ্তাহিকী, সাময়িকী, রেডিও টেলিভিশন গণমাধ্যমের উদাহরণ।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে গণমাধ্যম ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন, গণমাধ্যমের সংখ্যা যত বাড়বে, গণমাধ্যম বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে বেশি ভূমিকা পালন করতে পারবে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, গণমাধ্যমের বিস্তার বড় কথা নয়, বড় বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ওইসব গণমাধ্যম কি তত্ত্ব, তথ্য, সত্য প্রচার করা হচ্ছে তা (ইসলাম, ২০০০ঃ১৬১)। তাই বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা মূল্যায়ণ করতে হলে আমাদের দেখতে হবে স্থানীয় সরকার সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো জাতীয় সংবাদপত্রে কতটুকু আসছে, কি পরিমান গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হচ্ছে তা। আর এসবের জন্য প্রয়োজন আধেয় বিশ্লেষণ করা।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিষয়ে সংবাদপত্রগুলি কি ধরণের খবর পরিবেশন করছে, কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করছে তা জানার জন্য জাতীয় তিনটি সংবাদপত্র প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, বাংলা বাজার, দৈবচয়ণের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৮টি বিষয়ের উপর ২০০৪ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত মোট ছয় মাসের স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণের একক হিসাবে ২০০৪ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদকে কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশ করা হয়েছে। আবার স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে- তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে। ক)

সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান (খ) সংবাদের শিরোনামের আকার (গ) সংবাদের ধরণ প্রভৃতি। আর এ ক্ষেত্রে সংবাদগুলোকে সংখ্যায় এবং শতাংশে প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদ

সংবাদপত্রের সবচেয়ে মূল্যবান হলো স্থান বা Space সাধারণতঃ একটি সংবাদ পত্রিকায় কতটুকু জায়গায় প্রকাশ করা হয় সেটার উপর সংবাদের গুরুত্ব নির্ভর করে। গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি সাধারণতঃ বেশী জায়গা জুড়ে প্রকাশ করা হয় এবং সংবাদের শিরোনামও সেভাবে লেখা হয়। পক্ষান্তরে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর অল্প জায়গায় আলোচনা করা হয় এবং শিরোনামও সেভাবে দেওয়া হয়। আর তাই সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করে। পত্রিকায় একটি সংবাদ যে পরিমান জায়গায় ছাপানো হয় তা কলাম ইঞ্চিতে প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার বিষয়ক খবর বাছাইকৃত তিনটি দৈনিকে ছয় মাসে যে পরিমাণ জায়গায় ছাপানো হয়েছে তা নিম্নরূপ।

সারণী ৬.১ ঃ জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের আধেয়
(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

সংবাদপত্রের নাম	পরিমাণ (কলাম-ইঞ্চি)
প্রথম আলো	১৪৩০ (৪২.৯৮)
বাংলা বাজার	৮৬৫ (২৫.৯৯)
জনকণ্ঠ	১০৩২ (৩১.০১)
মোট	৩৩২৭ (১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় স্থানীয় সরকার বিষয়ক খবর সবচেয়ে বেশী প্রকাশ করেছে দৈনিক প্রথম আলো (৪২.৯৮ শতাংশ)। তিনটি পত্রিকা একত্রে এ বিষয়ে খবর প্রকাশ করেছে ৩৩২৭ কলাম-ইঞ্চি।

স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠাগত অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃষ্ঠাগত অবস্থান থেকে পাঠকরা সহজেই বুঝতে পারে সংবাদটিকে কতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি প্রথম পাতায় থাকে। প্রথম পাতার পর গুরুত্বপূর্ণ পাতা হলো শেষের পাতা। মাঝের পাতাগুলোতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা হয়। স্থানীয় সরকার বিষয়ক প্রকাশিত খবর তিনটি দৈনিকের পৃষ্ঠাগত অবস্থান নিম্নে দেখানো হলো।

সারণী ৬.২ ঃ জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের পৃষ্ঠাগত অবস্থান
(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

পৃষ্ঠাগত অবস্থান	প্রথম আলো	বাংলা বাজার	জনকণ্ঠ	মোট
প্রথম পৃষ্ঠা	৫(৪.০৬)	২(৪.৩৪)	৪(৯.৩০)	৭(৩.৩৬)
শেষ পৃষ্ঠা	৩(২.৪৩)	৩(৬.৫২)	২(৪.৬৫)	৮(৩.৮৪)
মধ্যবর্তী পৃষ্ঠা	১১৫ (৯৩.৪৯)	৪১(৮৯.১৩)	৩৭(৮৬.০৪)	১৯৩(৯২.৭৮)
মোট	১২৩(১০০)	৪৬(১০০)	৪৩(১০০)	২০৪(১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় বাছাইকৃত তিনটি জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় বিষয়ক খবর সবচেয়ে বেশী ছাপা হয়েছে মাঝের পাতায় (৯২.৭৮ শতাংশ)। অন্যদিকে প্রথম পাতায় (৩.৩৬ শতাংশ) এবং শেষের পাতায় (৩.৮৪ শতাংশ)। অর্থাৎ দৈনিকগুলো এ সংক্রান্ত সংবাদ কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে থাকে।

স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের শিরোনামের আকার

সংবাদের গুরুত্ব বুঝে প্রয়োজনীয় কলাম নির্ধারিত হয়ে থাকে। যে খবর যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয় তার কলাম সংখ্যাও বেশী হয়ে থাকে। অন্যদিকে কম গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য কলাম সংখ্যাও কম হয়ে থাকে। তাই সংবাদ পরিবেশনের উপর নির্ভর করে কলামের আকার নির্ধারণ। বাছাইকৃত তিনটি দৈনিকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক খবরের কলামের অবস্থান নিম্নে দেখানো হলো।

সারণী ৬.৩ ঃ জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের শিরোনামের আকার
(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

	সংবাদপত্রের নাম			
শিরোনামের আকার	প্রথম আলো	বাংলা বাজার	জনকণ্ঠ	মোট
১ কলাম	৬৯(৪৭.৯১)	১১(২৪.৪৪)	৪(১০.৮১)	৮৪(৩৭.১৬)
২ কলাম	৫২(৩৬.১১)	১৮ (৪০)	২৫ (৬৭.৫৭)	৯৫ (৪২.২৩)
৩ কলাম	১৫ (১০.৪২)	১৩ (২৮).৮৯)	৪ (১০.৮১)	৩২ (১৪.১৫)
৪ কলাম	৩ (২.০৮)	৩ (৬.৬৭)	২ (৫.৪১)	৮ (৩.৫৩)
৫ কলাম	৫ (৩.৪৭)	০	২ (৬.৪১)	৭ (৩.০৭)
মোট	১৪৪ (১০০)	৪৫ (১০০)	৩৭ (১০০)	২২৬ (১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

উপরের সারণীতে দেখা যায় জাতীয় দৈনিকে বেশীর ভাগ (৪২.০৩ শতাংশ) স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদ ছাপা হয় ২ কলাম শিরোনামে। অর্থাৎ এ বিষয়ক সংবাদ জাতীয় সংবাদগুলোতে খুব সামান্যই গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়।

স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের ধরণ

বিজ্ঞাপন ছাড়া সংবাদপত্রের পাতায় যা ছাপা হয় তাকে প্রধাণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সংবাদ (২) মতামত। সংবাদকে আরো দুইভাগে ভাগ করা যায়ঃ- (ক) সাদামাঠা সংবাদ; (খ) গভীরতার প্রতিবেদন। গভীরতল প্রতিবেদণকে আবার দুইভাগে ভাগ করা হয়। ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। মতামতের মধ্য আছে সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় এবং চিঠিপত্র। এছাড়া সংবাদের আরো একটি ধরণ আছে সেটা হলো ফিচার ধর্মী প্রতিবেদন। (ইসলাম, ২০০২ঃ১৬৪) । ঢাকার জাতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্থানীয় সরকার। বিষয়ক ৯০.১৪ শতাংশ সাদামাঠা বা উপরিতল প্রতিবেদন। ফিচার ৭.০৪ শতাংশ। সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় ১.৮৮ শতাংশ, ব্যাখ্যামূলক সংবাদ ৩.৪৭ শতাংশ এবং ০.৪৭ শতাংশ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

সারণী ৬.৪ ঃ জাতীয় দৈনিকে স্থানীয় সরকার বিষয়ক সংবাদের সংবাদের ধরণ

(বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা শতকরা হার নির্দেশক)

সংবাদের ধরণ	সংবাদপত্রের নাম			
	প্রথম আলো	বাংলা বাজার	জনকণ্ঠ	মোট
সাদামাঠা	১২০ (৯৬.৭৭)	৪২(৮৫.৭১)	৩০ (৭.৫)	১৯২ (৯০.১৪)
ফিচার	২ (১.৬১)	৪ (৮.১৬)	৯ (২২.৫)	১৫ (৭.০৪)
মতামত (সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়)	২ (১.৬১)	২ (৪.০৮)	০	৪ (১.৮৮)
ব্যাখ্যামূলক	০	১ (২.০৪)	০	১. (০.৪৭)
অনুসন্ধানী	০	০	১ (২.২২)	১ (০.৪৭)
মোট	১২৪ (১০০)	৪৯ (১০০)	৪০ (১০০)	২১৩ (১০০)

উৎস ঃ মাঠ জরিপ

স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন ঃ দেশের জাতীয় দৈনিকগুলো স্থানীয় সরকার বিষয়ক কি ধরণের খবর প্রকাশ করছে? কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে খবর ছাপছে তা জানার জন্য বাছাইকৃত তিনটি দৈনিকের কিছু সংবাদ শিরোনাম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

□ জনকণ্ঠ, ৪ জানুয়ারী, ২০০৪

সংবাদ শিরোনামঃ কলাপাড়ার সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বাররা কোণঠাসা, উন্নয়ণ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত না থাকায় জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন।

সংবাদ ভাষ্যঃ জনসেবা তো দূরের কথা, কলাপাড়ার বিভিন্ন ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের বহু মহিলা মেম্বার নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েই এখন শঙ্কিত। পরিষদের চেয়ারম্যান পুরুষ মেম্বারদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছেন তারা। অসহযোগিতার কারণে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কর্মকাণ্ড থেকে পড়েছেন পিছিয়ে। ক্রমশ সমর্থকদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। হারাচ্ছেন গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা, কেউ কেউ হচ্ছেন লাঞ্ছিত, কেউ আছেন চরম নিরাপত্তাহীনতার, জনসেবা করতে এসে এসব নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিরা সমর্থন হারানোর আশঙ্কায় অনেকেই এখন শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। নির্বাচন প্রাক্কালে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়ে আছেন নানা উৎকণ্ঠায়। কেউ কেউ মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে কোণঠাসা অবস্থানে আছেন। এই নানাবিধ সমস্যায় এখানকার সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বাররা আছেন চরম বিপাকে।

আলোচনা ঃ আলোচ্য সংবাদটি মাঝের পাতায় সাদামাঠা ভাবে ২৭.৫৬ কলাম ইঞ্চি জায়গায় ছাপানো হয়েছে। সংবাদটিতে কিছু গত বাধা খবর দেওয়া হয়েছে। অথচ কলাপাড়ার সংরক্ষিত মহিলা মেম্বারদের নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন তৈরী করতে পারতো। যে প্রতিবেদনে মহিলা সদস্যদের সমস্যাগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে মহিলা সদস্যদের যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরলে সংবাদটি আরও সমৃদ্ধ হতো।

□ বাংলা বাজার পত্রিকা, ২৮ জানুয়ারী ২০০৪

সংবাদ শিরোনাম ঃ ১২ বছরে ৩৫ জন চেয়ারম্যান খুন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল আবারো অশান্ত।

সংবাদ ভাষ্যঃ গত ১২ বছরে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ১০ জেলার মধ্যে ৮ জেলায় খুণ হয়েছে ৩৫ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। গত ১৪ জানুয়ারী সর্বশেষ সন্ত্রাসীদের গুলিতে খুন হয় খুলনা তেরখাদা উপজেলা সাচিয়াদহ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে একের পর এক এসব চেয়ারম্যান হত্যাকান্ডের সঠিক বিচার না হওয়ার সদ্য নির্বাচিত চেয়ারম্যানরা ভীত হয়ে পড়েছে। অধিকাংশই স্ব স্ব এলাকা ছেড়ে শহরে বসবাস করছে আর এ কারণে এলাকার উন্নয়ন কাজে মারাত্মক বিঘ্ন ঘঠেছে। ইউনিয়নবাসীরা যে কারণে ভোট দিয়ে তাদেরকে চেয়ারম্যান বানিয়েছেন। জনগণের সে উদ্দেশ্য ভেস্তে যেতে বসেছে।

আলোচনা ঃ উপরোক্ত সংবাদটি মাঝের পাতায় ২ কলামে, ৪২.৩৫ কলাম-ইঞ্চি জায়গায় সাদামাটা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অথচ ১২ বছরে ৩৫ জন জনপ্রতিনিধি কেন খুন হলো, তারা কোন অপরাধী চক্রের সাথে জড়িত কি-না এ সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা সংবাদে আসেনি।

□ বাংলা বাজার, ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪

সংবাদ শিরোনা ঃ খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে ইউপি চেয়ারম্যান নিহত।

সংবাদ ভাষ্যঃ খবরে প্রকাশ, খুলনার তেরখাদা উপজেলার সন্ত্রাসীরা গতকাল বুধবার ইউপি চেয়ারম্যান চান মিয়াকে গুলি করে হত্যা করে। জানা গেছে, বিকেলে পৌনে ৪ টার দিকে তেরখাদা উপজেলার সাচিয়াদহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান চান মিয়া শিকদার (৪৫) বাজার থেকে রিকসা করে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি তার বাড়ির কাছাকাছি পৌছলে সন্ত্রাসীরা তার গতিরোধ করে গুলি করে। এতে চেয়ারম্যান চান মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে মাঠিতে লুটিয়ে পড়েন এবং ঘঠনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

আলোচনা ঃ উপরোক্ত সংবাদটি প্রথম পাতায় ৫.৯৫ কলাম-ইঞ্চি জায়গায় এক কলামে ছোট করে প্রকাশিত হয়। এছাড়া সংবাদটি সাদামাঠা ভাবে তুলে ধরে। একজন জনপ্রতিনিধি হত্যা হওয়ার ঘটনাটি কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে পরিষদ চেয়ারম্যানকে কেন খুন হলো? কেউ গ্রেফতার হয়েছে কি-না এ সংক্রান্ত আর কোন খবর প্রকাশিত হয়নি।

☐ জনকণ্ঠ, ২৪ মার্চ, ২০০৪

সংবাদ শিরোনাম ঃ দলীয় চেয়ারম্যান না হলে উন্নয়ন বরাদ্দ পাওয়া যায় না।

সংবাদ ভাষ্য ঃ মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস জুনিয়রের উপস্থিতিতে বাগেরহাটে চেয়ারম্যানরা বললেন- দলীয় চেয়ারম্যান না হলে উন্নয়ন বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হয়। এমপির ইচ্ছাই এখানে সব, ইউনিয়নের উন্নয়ন তার মর্জির উপর নির্ভর করে। আর সব সরকারের আমলে এটা চলে আসছে। যা গ্রামীণ উন্নয়নের বড় অন্ত রায়। মুক্ত আলোচনায় বক্তাগণ ইউপি পর্যায়ে সম্পদ সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা সমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের কর্মক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিকতা, জবাবদিহিতা, ও স্বচ্ছতার অভাব অযাচিত হস্তক্ষেপ এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমবনতির কথা তুলে ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

আলোচনা ঃ উপরে উল্লেখিত সংবাদটি মাঝের পাতায় ২ কলামে ২১.৬৬ কলাম-ইঞ্চি জায়গায় প্রকাশিত হয়। সংবাদটিতে কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। তবে সংবাদটি মাঝের পাতায় সাদামাঠা ভাবে প্রকাশ করে এর গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস করা হয়েছে। সংবাদটি প্রথম পাতায় ছাপানো হলে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতো।

☐ প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

সংবাদ শিরোনাম ঃ রাজধানীতে সেমিনার, মহিলা সদস্যরা বললেন তারা মর্যাদা ও কাজ পাননা।

সংবাদ ভাষ্য ঃ স্থানীয় সরকারের মহিলা জনপ্রতিনিধিরা অভিযোগ করে বলেছেন, ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশে সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদেব কর্ম পরিধি সুনির্দিষ্ট নেই। ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যরা এ সংক্রান্ত আইন কানুন গোপন রেখে মহিলা সদস্যদেরকে নাজেহাল করেন। মহিলা জনপ্রতিনিধিরা বলেন, সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হলেও তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বিভিন্ন আশ্বাসবাণী শুনেই তাদেরকে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। তারা বলেন তাদেরকে সাধারণত ওয়ার্ড সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করতে হলেও সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধি হওয়ার কারণে মর্যাদা পান না। কর্মপরিধি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু জানা না থাকায় কাজ করতে গেলে তাদেরকে পুরুষ সহকর্মীদের গালমন্দ শুনতে হয়। এমনকি তাদেরকে সভাসমিতিতে নির্দিষ্ট বসার জায়গাও দেওয়া হয় না।

আলোচনা ঃ উপরোক্ত সংবাদটি মাঝের পাতায় ১৮.৯৯ কলাম-ইঞ্চি জায়াগায় ২ কলামে সাদামাটা ভাবে প্রকাশিত হয়। সংবাদে স্থানীয় সরকারের মহিলা প্রতিনিধিদের উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে অথচ সেমিনারে

প্রধান অতিথি কে ছিলেন, মূল প্রবন্ধ কে পাঠ করলেন, সরকারী কোন কর্মকর্তা ছিলো কি-না ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়নি। তাই এখানে সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনের দোষ-ত্রুটি দেখা যায়।

☐ জনকণ্ঠ, ১৭ জানুয়ারী, ২০০৪ ঃ গ্রাম সরকার ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত-

বাংলা বাজার, ৩১ মার্চ, ২০০৪ ঃ গ্রাম সরকার প্রধানদের হতে কাজ নেই। পদবি নিয়ে অনেকেই এখন বিব্রত।

সংবাদ ভাষ্য ঃ উপরোক্ত সংবাদ দুটিতে গ্রাম সরকারের কিছু প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরা হয়েছে। অধিকাংশ গ্রাম সরকার প্রধানই জানেনা তাদের কি কাজ। আবার ইউনিয়ন চেয়ারম্যানগণ বুঝে উঠতে পারছে না গ্রাম সরকারকে কি কাজে লাগানো হবে যেখানে উন্নয়ন বরাদ্দ একেবারেই কম। অনেকেই গ্রাম সরকার প্রধান কিংবা গ্রাম সরকার সদস্য এ পরিচয় মনে করতে কিংবা পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করছেন।

আলোচনা ঃ বর্তমান সরকার গ্রাম সরকার চালুর পর এর বিভিন্ন সমস্যা সংবাদপত্রে দেখা যাচ্ছে। সংবাদ পত্রে গ্রাম সরকার সম্পর্কে খবর প্রকাশিত হলেও তা গুরুত্ব দিয়ে ছাপছে না। উপরোক্ত খবর দুটি মাঝের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। অথচ খবর দুটি প্রথম পাতায় প্রকাশ হলে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতো। এছাড়া খবরটিতে গ্রাম সরকারের কাজের তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি অকার্যকর হবার সুনির্দিষ্ট কারণ তুলে ধরা হলে খবরটি সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল হতো। কিন্তু সংবাদ দুটিতে এই বিষয়গুলি এড়িয়ে গিয়েছেন।

☐ প্রথম আলো, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

সংবাদ শিরোনাম ঃ জেলা প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা জেলা পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজন।

সংবাদ ভাষ্য ঃ জেলা প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষা। পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে সুষ্ঠু সমর্থনের অভাব থাকলে কাজটি সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। পুলিশ ও জেলা প্রশাসকদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার উপর জোর দিতে হবে। আর দ্বিতীয়তঃ যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত দক্ষ ও মেধাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের বাছাই করে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনে নিয়োগ করতে হবে।

আলোচনা ঃ উপরোক্ত সংবাদটি প্রথম আলোর সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয়। এখানে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাবের প্রতি ইংগিত দিয়েছেন। অথচ কেন সমন্বয়ের অভাব হচ্ছে, কোন কোন বিষয়ে সমন্বয়হীনতা হচ্ছে তা উল্লেখ করা হয়নি।

বাছাইকৃত সংবাদপত্র হতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ ঃ

১। বাংলাদেশের চার স্তর বিশিষ্ট্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও জেলা পরিষদ সংক্রান্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য খবর পাওয়া যায়নি।

২। জেলা পরিষদগুলো কেন দীর্ঘদিন যাবৎ স্বায়তশাসন পাচ্ছেনা এ সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট পত্রিকায় আসেনি। কিংবা জনগণের মতামতও তুলে ধরা হয় নি।

৩। জনগণের প্রত্যেক্ষ ভোটে জেলা পরিষদ নির্বাচন হলে কি ধরণের সুবিধা দেশবাসী পেতো সে সম্পর্কে বিশেষ নিবন্ধ, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রকাশ হয়নি।

৪। বর্তমানে দেশের জেলা পরিষদগুলো কেমন চলছে, পরিষদের অসুবিধা, পরিষদগুলোর আর্থিক দুর্নীতি, পরিষদের কাজের প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়নি।

৫। ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে দৈনিক গুলোতে খবর প্রকাশিত হলেও তা কম গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

৬। উপজেলা পরিষদ সম্পর্কে কম খবর ছাপানো হয়েছে। যা ছাপানো হয়েছে তা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়নি।

৭। স্থানীয় সংস্থাগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সুপারিশ সংক্রান্ত রিপোর্ট উল্লেখযোগ্য ভাবে পত্রিকায় আসেনি।

৮। কিংবা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীর অংশগ্রহণে যে সব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা অপসারণের জন্য তেমন কোন খবর দেখা যায় নি। দু-একটি খবর যদিও প্রকাশিত হয়েছে তবে তা কম গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো হয়েছে।

৯। অধিকাংশ খবরগুলি মাঝের পাতায় দেওয়া হয়েছে।

১০। স্থানীয় সরকার বিষয়ে ব্যাখ্যামূলক কোন আলোচনা নেই।

১১। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার গুলোকে কিভাবে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী করা যায় এ সংক্রান্ত কোন মতামত নেই।

১২। স্থানীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব কেন গড়ে উঠছে না, কিংবা নেতৃত্ব গড়ে না ওঠার কারণ কি, এ ধরণের সংবাদ চোখে পড়েনি।

১৩। স্থানীয় সরকার বিষয়ক অনুষ্ঠিত সেমিনারের খবর কম গুরুত্ব দিয়ে ছাপানো হয়েছে।

১৪। মতামত সংক্রান্ত লেখাগুলোতে তথ্যের অপ্রতুলতা দেখা যায়।

১৫। জনগণ কেমন ধরণের স্থানীয় সরকার চায় এ সংক্রান্ত গবেষণামূলক কোন লেখা ছিলো না।

১৬। ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে সরকার কোন পদ্ধতিতে অর্থ বরাদ্দ করে অথবা কাদের মাধ্যমে বরাদ্দ করে এ ধরণের খবর দেখা যায়নি।

১৭। পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সরকার ও প্রশাসনের কাছে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে যে খুবই অসহায় তা সংবাদ পত্র গুলোতে প্রচার করা হয়নি। এটা করা হলে জনগণ পরিষদের সদস্যদের সম্পর্কে উচ্চ- ধারণা পোষণ করতো।

১৮। গ্রাম সরকার সদ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এ সংক্রান্ত খবর কম ছাপানো হয়েছে।

১৯। স্থানীয় সরকার বিষয়ক খবরগুলি জাতীয় দৈনিকগুলোতে গুরুত্বসহ প্রকাশ করা হয় না।

২০। সংবাদপত্রে যে খবরগুলি প্রকাশিত হয় তা অধিকাংশই সাদামাটা।

২০। ব্যাখ্যামূলক এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় খুবই কম।

পরিশেষে বলা যায় বৃটিশ আমলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও একবিংশ শতাব্দীতে এসে এটি একটি কার্যকর কাঠামো গ্রহণ করতে পারেনি। বারবার সরকার পরিবর্তনের সাথে এর কাঠামো পরিবর্তন হয়েছে। ফলে জনগণ দীর্ঘকাল ধরে নানা বঞ্চনার শীকার হয়েছেন। তাই দেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোতে স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন সংবাদকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরতে হবে। আর তা হলেই স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়াও অন্যান্য গনমাধ্যমগুলি প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশন করে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৭ম অধ্যায়

গবেষণা ফলাফল ও সুপারিশ মালা

তৃণমূল পর্যায়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমি দেখলাম এ ক্ষেত্রটি এখনও অনেক সমস্যাকীর্ণ। এখানে যদিও কাজ করার অনেক সুযোগ আছে এবং বিভিন্ন ধরণের গবেষনাও হচ্ছে তারপরেও বিষয়টি যথেষ্ট পরিমাণে অবহেলিত। কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষমতায়ন না হলে এদেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কারণ দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বসবাস করে তৃণমূল পর্যায়ে। তাই আমার গবেষণার আলোকে আমি প্রাপ্ত ফলাফল এবং কিছু সুপারিশমালা তুলে ধরলাম।

⇒ গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে ইউনিয়ন পরিষদের প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। তাদের ইউনিয়ন পরিষদের কাজের প্রতি আস্থা না থাকলেও পরিষদের দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। সে জন্য দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৪২.২২% মতামত প্রদানকারী জানিয়েছেন পরিষদ সঠিক ভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে না। অন্যদিকে নাসিরবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সীমিত সম্পদ নিয়েও ইউনিয়নের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাতে ৮৪.৪৪% মতামত প্রদানকারী জানিয়েছেন পরিষদ সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

⇒ পরিষদ তার কাজের জন্য জনগণের বিশ্বাসযোগ্যতা হারালেও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ইউনিয়নের জনগণ পরিষদের সমদস্যদের পূর্ণ সহয়োগিতা করে। অর্থাৎ ইউনিয়নবাসী ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য পরিষদকে কার্যকর রাখার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত।

⇒ ইউনিয়নের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের সুনির্দিষ্ট বন্টন না থাকাতে পুরুষ সদস্যরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। অপরদিকে মহিলাদের কম গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদকে উন্নয়ন সংক্রান্ত যে ধরনের কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে বাস্তবে সে ধরনের কাজের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। বিভিন্ন খাদ্য সহায়তা প্রকল্পের আওতায় কাঁচা রাস্তা তৈরী, রিলিফ বিতরনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সীমিত রয়েছে।

⇒ গ্রামের সাধারণ জনগণ মহিলা সদস্যদের যোগ্যতা নিয়ে এখনও সনাতন ধারণা পোষণ করে। দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৭১.১১% ও নাসিরবাদ ইউনিয়নের ৭৩.৩৩% মতামত প্রদানকারী মনে করে মহিলা সদস্যদের চেয়ে পুরুষ সদস্যরা ভালো কাজ করে। অপরদিকে দুটি ইউনিয়নের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মতামতে জানা যায় পুরুষ সদস্যদের তুলনায় মহিলা সদস্যরা তাদের কাজের ক্ষেত্রে বেশী আন্তরিক।

⇒ মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ দুটো ইউনিয়নের অধিকাংশ মতামত প্রদানকারী সমর্থন করেছেন। তাদের মতে ইউনিয়নের অর্ধেক জনগোষ্ঠী যেহেতু নারী তাই নারীর অধিকার আদায় ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

⇒ জনগণের মতামত জরীপে অংশগ্রহনকারীদের মতে নির্বাচনের পূর্বে মহিলা সদস্যরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো পরবর্তীতে তারা তা রক্ষা করেনি। ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হন।

⇒ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীদের মতে মহিলা প্রতিনিধিদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত বলে তারা মনে করেন। অন্যদিকে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যে আসন বণ্টন কাঠামোটি তারা সমর্থন করেননি।

⇒ মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সামাজিক, ধর্মীয়, নিরাপত্তা ও পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা দায়ী।

⇒ জনগণের মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতে সরকার যে পরিমান অর্থ উন্নয়নের জন্য পরিষদকে প্রদান করে তা সঠিক ভাবে ব্যয় হয় না। বরাদ্দ দেওয়া অর্থের পরিমাণ ও প্রয়োজনের তুলনায় কম। সরকারের অধিক পরিমান অর্থ ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ দেওয়া উচিৎ।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের ভাতা হিসেবে যে অর্থ প্রদান করা হয় তা যথেষ্ট নয়। দক্ষিণগাঁও ও নাসিরবাদ ইউনিয়নের জনগণের মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মতে সদস্যদের ভাতা বৃদ্ধি করা উচিৎ।

⇒ মহিলা সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণে দেখা যায় তিনটি ওয়ার্ড হতে তারা নির্বাচিত হয়েও তারা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছেন। তাদের মতে একজন সাধারণ সদস্যর তুলনায় তাদের তিনগুণ বরাদ্দ পাওয়া উচিৎ। কিন্তু তারা যা বরাদ্দ পাচ্ছেন তা দিয়ে তিনটি ওয়ার্ডের মাঝে সমতা রক্ষা করা সম্ভব নয়।

⇒ পুরুষ সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ করে অপরদিকে মহিলা প্রতিনিধিদের বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবা মূলক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

⇒ পরিষদের পুরুষ সদস্যরা মহিলাদের কাজে তেমন সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখাচ্ছে না। তাই মহিলা সদস্যরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ছে। পুরুষ সদস্যরা মহিলাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে কাজ করতে ইচ্ছুক নয়।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলে পুরুষ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ থাকলেও মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ নেই। বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে নারী সদস্যদের দায়িত্ব সুস্পষ্ট করে বলা হলেও বাস্তবে মহিলা সদস্যদের হাতে ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। অর্থাৎ ক্ষমতা কাগজ কলমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

⇒ সরকারী আমলারা স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হোক মনে প্রাণে তা চায়না এবং সে কারণে একের পর এক পরিপত্র জারি করে ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎসকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নিয়ে নিয়েছে। ফলে, ইউনিয়ন পরিষদ নিজস্ব উদ্যোগে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখেনা।

⇒ গবেষণার উদ্দেশ্য সংগৃহীত ইউনিয়ন পরিষদের জয়ী সদস্যদের জীবন বৃত্তান্তে দেখা যায় সদস্যদের অধিকাংশই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক। নির্বাচনের পূর্বে তারা এলাকাবাসীকে এলাকার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো কিন্তু দায়িত্ব পাওয়ার পর তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করতে পারেনি বলে তারা হেয় প্রতিপন্ন হয়।

⇒ গবেষণায় তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য দুটি ইউনিয়নের ৯০ জন সাধারণ জনগণের মতামত নেওয়া হয়। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের শিক্ষক ১৩%, শিক্ষার্থী ১৩%, গৃহবধূ ১৬%, মৎসজীবি ৭%, কৃষক ১১%, মাঝি, ৯% এবং ১৩% ছিলো চাকুরিজীবি। অপরদিকে নাসিরাবাদ ইউনিয়নের শিক্ষকতা

১৫%, শিক্ষার্থী ১১%, ব্যবসা ১১%, গৃহবধূ ১৬%, মৎসজীবি ৯%, কৃষক ১৩%, মাঝি ৯% এবং ১৬% ছিলো চাকুরিজীবি।

তাদের মতামতের বেশ কয়েকটি দিক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৫৮% ও নাসিরবাদ ইউনিয়নের ৬২% মতামত প্রদানকারী মনে করেন তাদের এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ হয়নি। দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৬৪% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৫৩% মনে করে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৮৪% ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের ৭৩% মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদের সরকারী বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা উচিৎ।

⇒ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ইউনিয়নের জন্য করেছেন বলে দাবী করেছেন। পাশাপাশি তারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কথাও উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে জনমত জরিপ যাচাইয়ে দেখা গিয়েছে রাস্তাঘাট সংস্কার, ভি,জি,এফ, কার্ড বিতরণ ছাড়া মেতন উল্লেখযোগ্য কাজ তারা করেন নি।

⇒ জনগণের মতামত জরিপে অংশগ্রহণকারী দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ও নাসিরাবাদ ইউনিয়নের মতামত প্রদানকারীরা বলেছেন ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থায় সাধারণ আসন ও সংরক্ষিত আসনের সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। তাদের মতে মহিলা সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়না।

⇒ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের সাক্ষাৎকার বিশ্লেষণে দেখা যায় দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের প্রাইমারী পাস ১৫%, হাইস্কুল ৩৮%, এসএসসি ১৫%, এইচএসসি ১৫% এবং স্নাতক পাশ ১৫%। অর্থাৎ দক্ষিণগাঁও ইউনিয়নের ৩৮% সদস্যই হাইস্কুল পাশ সমতুল্য পড়াশুনা করেছে। অপরদিকে নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ১৫% প্রাইমারী পাশ, ২৮% হাইস্কুল, ১৫% এসএসসি, ১৫% এইচএসসি এবং ৩০% স্নাতক শিক্ষায় শিক্ষিত। যেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শিক্ষার মান নিম্ন। সেখানে তাদের কাছ থেকে ভাল নেতৃত্বের গুণাবলী আশা করা যায় না।

⇒ দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের অধিকাংশ সদস্য ব্যবসার সাথে জড়িত। যে দেশের রাজনীতিকে ব্যবসায়ী সমাজ নিয়ন্ত্রণ করে সে দেশে কোন সুষ্ঠু রাজনৈতিক চর্চা হতে পারে না।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ও সম্পদের ভিত্তি খুবই দুর্বল। বিশেষ করে কর সংগ্রহের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। আর্থিক ও সম্পদের দুর্বল ভিত্তি এবং ইতিবাচক প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে ইউনিয়ন পরিষদ নিজ উদ্যোগে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে পারে না।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্যর হস্তক্ষেপ ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্প বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন এবং সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে জঠিল করে তুলেছে।

⇒ কেন্দ্র হতে অর্থ সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদে না পাঠানোর ফলে পরিষদ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারছে না।

⇒ সরকার ও এনজিও উভয়ের মাঠ পর্যায়ের উন্নয়ন সম্প্রসারন কর্মীদের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের প্রাতিষ্ঠানিক ও যৌথ কর্মতৎপরতা নেই, ফলে সরকার ও এন,জি,ও,গুলি ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে থাকে।

⇒ বর্তমান সংসদ সদস্যদের স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করায় এবং যে কোন উন্নয়ন কার্যক্রম তাদের মাধ্যমে বরাদ্দ দেওয়ার ফলে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিগণের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

প্রস্তাবিত সুপারিশমালা

বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপরোক্ত আলোচনা ও ফলাফলের ভিত্তিতে তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কিভাবে হতে পারে তা খুজে বের করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য বিস্তর কাজের দায়িত্ব ও সংবিধান প্রদত্ত আইন রয়েছে। তারপরও কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা ও নিয়মকানুনের অসমাঞ্জস্যতা তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারেনি। এখানে শুধু কাজজে কলমে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বাস্তবে ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। সেজন্য সুষ্ঠু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তাই আমি এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও কেসস্টাডি সমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছি।

⇒ আমাদের দেশের স্থানীয় সংস্থাসমূহকে সব সময় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়। স্বাধীনতার পর বিভিন্ন সরকার প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণের নামে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা

নিরীক্ষা চালিয়েছে। এ ধারা এখনও সক্রিয় রয়েছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বাংলাদেশের দুর্বল সমাজ কাঠামোর জন্যই মূলত এরূপ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের অপ্রত্যাশিত সমস্যা থেকে মুক্তিলাভ করতে হলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সামাজিক পরিবর্তন ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদগুলো সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল। কারণ পরিষদের আয়ের উৎস সীমিত। আর্থিক সম্পদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকতে হলে স্থানীয় উন্নয়ন কখনই দ্রুততা ও নিশ্চয়তার সাথে সম্পন্ন হবে না। তা'ছাড়া অর্থনৈতিক প্রয়োজনে কেন্দ্রের উপর অত্যধিক নির্ভরতার ফলে স্থানীয় উদ্যোগ ও দায়িত্ব স্তিমিত হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

⇒ আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার প্রশাসনের জন্য শিক্ষিত, সৎ নেতা নির্বাচন করা দরকার। বাংলাদেশের অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই কম। সরকারের উচিৎ সদস্যদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান পদের জন্য স্নাতক ডিগ্রী ও সাধারণ সদস্যদের জন্য এইচ এস সি পাশ নির্ধারিত হওয়া উচিত।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ইউনিয়ন পরিষেদের সদস্যরা গ্রামের জনগণকে সম্পৃক্ত করলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। পাশাপাশি গ্রামের টাউট শ্রেণীকে উন্নয়ন কর্মকান্ড হতে বাদ দিতে হবে। এতে উন্নয়নের ফল সবাই ভোগ করতে পারবে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাক্ষাৎকারে জানা যায় পরিষদের সাথে নিকটবর্তী থানার কাজের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। পরিষদ তার প্রয়োজনে থানার সহযোগিতা চাইলে থানা যাতে গড়িমসি না করে সাহায্যে এগিয়ে আসে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

⇒ আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় স্তরায়িত সমস্যা একটি অন্যতম সমস্যা। এখানে কখনও তিন স্তর বিশিষ্ট্য কখনও চার স্তরবিশিষ্ট্য স্থানীয় সরকার চালু হয়। চার স্তরবিশিষ্টা স্থানীয় সরকার আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। চার স্তরবিশিষ্ট্য স্থানীয় সরকার অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় এতগুলো স্তরের প্রয়োজন নেই। ইউনিয়ন পরিষদের পর গ্রাম সরকার নামে একটি স্তর করা হয়েছে। গ্রাম সরকারের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৪ জনই অনির্বাচিত। এটার কাজ কেবল বিশাল দায়িত্বের পর্যালোচনা ও তদারকি

করা। অর্থাৎ এটা কোন প্রশাসনিক ইউনিট না। ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিকভাবে ইউনিয়ন পরিষদের উপর নির্ভরশীল। অথচ ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়ালে এরূপ বাড়তি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া গ্রাম সরকারের প্রায় সকল কাজে এখন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাগুলো সকল প্রকার নৈতিক এবং আর্থিক সমর্থন এবং সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। সর্বোপরি সরকারী কর্মচারীদের যথাযথ তদারকি, নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তাদের কাজের পরিধি এবং দায়বদ্ধতা বাড়ানো গেলে বাকী কাজগুলো সুষ্টুভাবে করা সম্ভব। সুতরাং সরকারের এ বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ রয়েছে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের কাজে থানা প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে থাকে এতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। সুতরাং থানা প্রশাসনের উচিৎ ইউনিয়ন পরিষদকে দিক নির্দেশনা দেওয়া, তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করা নয়।

⇒ যেহেতু গ্রাম সরকারের যাবতীয় খরচের অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল হতে দেওয়া হবে তাই সরকারের উচিৎ ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করে এবং তার ভাগ গ্রাম সরকারকে দেওয়া।

⇒ দেশের জনগণের কল্যান নিশ্চিত করতে হলে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থায়ন করতে হবে। সরকারের উচিৎ উন্নয়ন বাজেটের পুরো অর্থ সরাসরি ইউনিয়ন পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা। এতে করে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি সমস্যার সমাধান দ্রুততর হবে।

⇒ আমাদের দেশে যে সব বিধিবিধান দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হয় সে সব ক্ষেত্রে দুটো পর্যায় আইনি পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমতঃ যে সব আইনের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হয় সে সব আইনগুলো নির্দিষ্টভাবে নেই। দেখা যায় কোন কাজ করতে গেলে বিভিন্ন ধরনের সার্কুলারের কথা বলা হয়। বলা হয়, ঐ সার্কুলার অনুসারে কাজটি করা যাবে না। এর জন্য লোকাল গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট গুলি আগে ঠিক করতে হবে। লোকাল গভর্ণমেন্ট এ্যাক্ট সুনির্দিষ্ট করা না গেলে সব সময় কাজের ক্ষেত্রে জঠিলত থেকেই যাবে। এটা করা হলে ইউনিয়ন পরিষদও শক্তিশালী হবে এবং সার্কুলারের দোহাই দিয়ে যে ধরনের জঠিলতা সৃষ্টি হয় তা কমে যাবে। দ্বিতীয় পর্বে ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়েলটা হালনাগাদ করতে হবে। আমাদের বর্তমানে যে ম্যানুয়েল আছে সেটা অনেক

পুরনো। নতুন ম্যানুয়েলে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের কাজের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে পরিষদের সদস্যদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে।

⇒ আমাদের দেশের জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই। তারা পরিষদের সদস্যদের সম্পর্কে অত্যন্ত নিম্ন ধারনা পোষণ করে। তাদের ধারনা পরিষদের সদস্যদের কাজ গম বিতরণ করা ও আত্মসাৎ করা। এ ধরনের ধারণার কারণ হলো পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের সচেনতার অভাব। তৃণমূল পর্যায়ে অনেক সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি রয়েছে যারা সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে; কিন্তু তারা প্রায়শই পেতে রাখা দুর্নীতির ফাঁদে পড়ে যান এবং সেখান থেকে তারা বের হতে পারেনা। এছাড়াও পরিষদের সদস্যদের সীমিত সম্পদ নিয়ে কাজ করতে হয় ফলে তাদের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও জনগণের জন্য তারা ভালো কিছু করতে পারে না। অন্যদিকে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারী অর্থ ব্যয়ের অধিকাংশের ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তাদের সব সময় কাজ করতে হয় সরকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশ অনুসারে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ তোলা হয় তা অনেক ক্ষেত্রে সত্য নয়।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বার ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে অনেক সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য তাদের প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সংসদ সদস্যদের এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মূল উৎস হচ্ছে বিভিন্ন সময় প্রশাসনিক সার্কুলারের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা। এছাড়া কোন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হতে কোন অনুদান ইউনিয়ন পরিষদকে দেওয়া হলে প্রকল্প আসার কাগজে লেখা থাকে স্থানীয় সংসদ সদস্যর সাথে আলাপ করে কাজ করবেন। এর ফলে স্থানীয় সংসদ সদস্য তার ইচ্ছে অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নামে অর্থ বরাদ্দ করে। তাই পরিষদের গৃহীত অনেক ভালো ভালো প্রকল্প অনেক সময় বাতিল হয়ে যায়। সরকারের উচিৎ, এ ধরণের প্রতিবন্ধকতাগুলি তুলে দিয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের হাতে ভূমি রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। খাসজমি বন্টনের ক্ষমতা পরিষদের হাতে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া হলে জমি জমা সংক্রান্ত অনেক জটিলতা এড়ানো সম্ভব হবে। এছাড়া ট্যাক্স বা খাজনা আদায়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সদস্যদের দেওয়া হলে এবং আদায়ের উপর তাদের একটি নির্দিষ্ট কমিশন দেওয়া হলে একদিকে যেমন ইউনিয়ন পরিষদের আয় বাড়বে অন্যদিকে তারাও দায়িত্ব সহকারে খাজনা আদায়ের উৎসাহ পাবে।

⇒ সরকারী বরাদ্দ ইউনিয়ন পরিষদের কাছে সরাসরি প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থ বরাদ্দ এমন ভাবে দিতে হবে যাতে করে পরিষদ ইউনিয়নের অভ্যান্তরে রাস্তাঘাট নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে পারে। বর্তমানে যে পরিমান অর্থ দেওয়া হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। তাই ইউনিয়নের উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও অর্থ খরচের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধিদের খারাপ কাজগুলোকেই কেবল সংবাদপত্রে তুলে ধরা হয়, ভালো কাজ তুলে ধরা হয় না। নাটক সিনেমাতেও তাদেরকে খারাপ ভাবে উপস্থাপন করা হয়। এটা মোটেও ঠিক নয়। ইউনিয়ন পরিষদের সব চেয়ারম্যান গম চুরি করে এটা সত্য বিষয় নয়। ইউনিয়ন পরিষদের ভালো উদ্যোগগুলোকে জনসাধারণকে জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার বিষয়ক বিভিন্ন খরব গুরুত্ব দিয়ে সংবাদপত্র গুলির প্রকাশ করা উচিৎ।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা ও জনসভার ব্যবস্থা করতে হবে।

⇒ জাতীয় সরকারের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ হিসাবে মনোনীত না করে, তার পরিবর্তে উপরিস্থিত স্থানীয় সরকার সংস্থাকেই মনোনীত করা উচিৎ। যেমন, ইউনিয়ন পরিষদের জন্য নিয়ন্ত্রন কর্তৃপক্ষ হিসাবে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে মনোনীত করা উচিত।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষিত, চরিত্রবান ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিৎ। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম। জনগণের উচিৎ যোগ্য ব্যক্তি মনোনীত করা।

⇒ সাক্ষাৎপ্রদানকারী মহিলা সদস্যরা বলেছেন যে, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ পুরুষ সদস্যদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন, দারিদ্র্য নিরসন, সংক্রান্ত কাজে পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণ নারী সদস্যদের তুলনায় প্রায় দিগুণ। একইভাবে মেরামত কাজ যেমন রাস্তা নির্মাণ, সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, পানীয় জল ও স্যানিটেশন, শিক্ষা, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত পরিসরে। অপরদিকে নারী সদস্যদের ভিজি এফ কার্ড বিতরন, পরিবার পরিকল্পনা শিশু টিকা দান, বৃদ্ধ ভাতা প্রদান ইত্যাদি কাজে নারী সদস্যরা

অংশগ্রহণ করে থাকে। নারী সদস্যরা যেহেতু জনগণের প্রতিনিধি তাদেরও সমাজ কল্যান মূলক কার্যাবলী করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। তারা যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে অধিক হারে অংশগ্রহন করতে পারে সেজন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

⇒ নারী সদস্যরা পরিষদের কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে পুরুষ সহকর্মীদের অসহযোগিতা পেয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে গ্রামের টাউট শ্রেণীর দ্বারা বিরূপ আচরণের সম্মুখীন হন। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য সুশীল সমাজ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া নারী সদস্যরা যাতে নিরাপদে দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় জনমত গড়ে তোলা দরকার।

⇒ নারী সদস্যরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড সহ সব ধরনের কাজে যাতে অংশগ্রহন করতে পারে সে জন্য পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের আলাদা তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়াল হাল নাগাদ করে নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করার দরকার রয়েছে। এতে করে নারী সদস্যরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে ও পরিষদের কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা পাবে।

⇒ নারী সদস্যদের কাজের পৃথক তালিকা প্রণয়নের পাশাপাশি ইউনিয়নের আসন বন্টন কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে দু ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। পুরো ইউনিয়ন এলাকাকে নুতনভাবে বন্টন করা। অথবা একজন সাধারণ আসনের সদস্যের তিনগুণ পরিমান সম্পদ একজন নারী সদস্যকে বরাদ্দ দেওয়া।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের যে পরিমান মাসিক ভাতা প্রদান করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যেখানে একজন পুরুষ ওয়ার্ড সদস্যকে একটি ওয়ার্ডের দেখাশুনা করতে হয়। সেখানে নারী প্রতিনিধিকে ৩টি ওয়ার্ড দেখাশুনা করতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের যাতায়াত খরচ বেশী হয়। তাই তাদের মাসিক ভাতা এমন ভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিৎ যাতে করে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি না হয়। এছাড়া মাসিক ভাতা তারা যেনেও নিয়মিত পান সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের নারী পতিনিধিদের সকল স্ট্যান্ডিং কমিটিতে রাখার বিধান করতে হবে। যে সব ইউনিয়নের স্ট্যান্ডিং কমিটি নেই সেখানে যাতে স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন করা হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি এ সকল কমিটির কর্মকান্ড যাতে

গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে শুধু নারী সদস্য নয়, সামগ্রীক ভাবে ইউনিয়ন পরিষদ শক্তিশালী হবে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সভায় নারী সদস্যদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। এর জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমতঃ পরিষদের সভায় ২ জন নারী সদস্য উপস্থিত না হলে কোন সভার কোরাম হবে না এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা। দ্বিতীয়তঃ কোরাম না হওয়া কোন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গ্রহণযোগ্য হবে না। তৃতীয়তঃ কোরাম হওয়ার বিষয়টি নিয়মিত মনিটর করা। যে ইউনিয়ন পরিষদ এ বিষয়ে অবহেলা দেখাবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত সকল সার্কুলার তথ্য নির্বাচিত সদস্যরা, বিশেষ করে নারী সদস্যরা যাতে পায় তার ব্যবস্থা করা।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের বন্টন কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করা।

⇒ নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে যাতে করে নারীরা পুরুষদের সংগে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশে কাজ করে নিজেদের অধিকার আদায় সুসংগঠিত করতে পারে।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাদের জন্য ব্যাপক ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর অর্ন্তভূক্ত থাকবে, ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা, কাজ ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা। স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহের কৌশল, বাজেট প্রণয়ন, ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সম্পর্কে আইন ও নিয়ম কানুন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা প্রণালী প্রণয়নের কারিগরি দক্ষতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ, সভা পরিচালনা, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি।

⇒ ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোকে কার্যকর করতে হবে। গ্রামের মানুষের জীবনের সবচেয়ে জরুরী ও প্রত্যক্ষ প্রয়োজন যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ কাঠামো। পানীয় জল সরবরাহ, কৃষি উন্নয়ন মানব সম্পদ উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন এর মধ্যেই ইউনিয়ন পরিষদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ।

⇒ বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনীতিকে ব্যবসায়ী শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করছে। স্থানীয় সরকার প্রশাসনেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীরা দেশের উন্নয়নের চেয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদাই সচেষ্ট থাকে। তাই তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত রাজনীতিকে সচল রাখতে হলে ব্যবসায়ী শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

⇒ দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে। এ জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপশি জনগণকে প্রশাসনের কাজে সহযোগিতা করতে হবে।

⇒ গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের উচিৎ তাদের কাজে গ্রামের সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা। এতে করে যে কোন জটিল কাজ সহজে করা সম্ভব হবে।

⇒ দেশের সার্বিক উন্নতি চাইলে উন্নয়নের ধারা গ্রাম থেকে শুরু করতে হবে। গ্রামের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

উপসংহার

পৃথিবীর সকল স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিই হচ্ছে সেদেশের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। কারণ, এ পর্যায়েই দেশের জনগণ বিপুলভাবে জনকল্যানমূলক কাজে অংশগ্রহনের সুযোগ থাকে। দেশের সত্যিকারের উন্নতির জন্যে জনগণের অংশ গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। যাদের জন্য উন্নয়ন প্রয়োজন, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকলে উন্নয়ন হয় না, হলেও মজবুত হয় না। রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে, জনকল্যানমূলক কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহন খুব প্রয়োজন। এ কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হলো জনগণের অংশগ্রহনের প্রকৃত স্থান। কার্যকর স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গণতন্ত্র তৃণমূলে সম্প্রসারিত হয়। ফলে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। এই বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ নিতে পারে না।

বিকেন্দ্রীকরণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কোন নতুন ধারনা নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলো যে দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছিল তার অন্যতম হচ্ছে প্রশাসনিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা। কিন্তু ষাট দশকের শেষ দিকে দেখা যায়, বিকেন্দ্রীকরণ আশানুরূপ কাজ করছে না। নগর বিত্ত অভিমুখীন অসম উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। বরং তাদের অবস্থা ভালো না হয়ে দিন দিন খারাপ হচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দরিদ্রদের কোনো ভূমিকাই থাকছে না। অথচ নাগরিকদের সার্বিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য দেশের উপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রায়ন একান্ত অপরিহার্য।

স্থানীয় সরকারের ধারনা বিকেন্দ্রীকরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণত থেকে উদ্ভুত। বর্তমান কালে শাসনপদ্ধতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। তাই বৃহদায়তন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একক ভাবে দেশের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা সম্ভব নয়, তাই স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ লাঘব করার জন্য রাষ্ট্রের সমগ্র ভূ-খন্ডকে বিভিন্ন এলাকার ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়। এসকল বিভাজিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সমুহই হল স্থানীয় সরকার।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। তৃণমূল পর্যায়ে রাজনীতিতে প্রবেশ প্রথম সোপান হলো ইউনিযন পরিষদ। সাধারণতঃ ১০/১৫ হাজার অধিবাসী

অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় একটি ইউনিয়ন। এসকল ইউনিয়নে স্থায়ীয়ভাবে কাজকর্ম করার জন্য একটি "ইউনিয়ন পরিষদ" গঠন করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন সময় ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। আমরা এদেশের স্থানীয় সরকারের ক্রম বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করলে এর কিছু বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে স্থানীয় সরকারের ক্রমবিবর্তনকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি (১) প্রাচীন ও মধ্য যুগ (২) মুগল যুগ (৩) বৃটিশ যুগ (৪) পাকিস্তান পর্যায় (৫) বাংলাদেশ পর্যায়।

যদিও উপমহাদেশে আধুনিক স্থানীয় সরকার কাঠামো বৃটিশদের সৃষ্টি, তথাপিও প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলাদেশে প্রচুর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। ভিডিষ্ট আমল ম্যুর শাসনামল ও শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহর শাসনামলে এক ধরনের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল। এদের শাসনামলে স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিটি স্তরে একজন করে শাসক থাকতেন। তারা সকলেই রাজার দ্বারা নিয়োগ পেতেন। পরবর্তীতে স্থানীয় সংস্থা হিসেবে গ্রাম পঞ্চায়েত দেখতে পাই। সে সময় গ্রামগুলো আধুনিক রাষ্ট্রের মতো সর্ব সাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত গ্রাম প্রধান দ্বারা পরিচালিত হতো। গ্রাম পঞ্চায়েৎ গ্রামের শান্তি শৃংখলা রক্ষা, বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এই পঞ্চায়েৎগুলো সামন্ত প্রভুদের হাতে কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই সমাজের দরিদ্রদের ওপর শোষন চালাতো। প্রচলিত প্রথার উপর নির্ভর করে এ সময় শাষন ব্যবস্থা পরিচালিত হতো, কোন লিখিত আইন বা বিধি বিধান ছিল না। ১৭৫৬ সালে বাংলাদেশ মুঘল সাম্রাজের অন্তর্ভূক্ত হয়। তারা সুদীর্ঘকাল গ্রামীন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকান্ডে হস্তক্ষেপ করেনি। এ সময় প্রতিটি গ্রামে নিজস্ব পঞ্চায়েত কাউন্সিল ছিল প্রতিটি গ্রামে। তারা প্রতিটি গ্রামে একজন করে গ্রাম প্রধান নিযুক্ত করতেন। তিনি গ্রাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখতেন। মোঘল শাসন ব্যবস্থা ছিল কেন্দ্রমুখীন, তারা স্থানীয় পর্যায়ের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব স্থানীয় নেতৃত্বের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বৃটিশদের এ অঞ্চলে আগমনের পর গ্রাম পঞ্চায়েত আস্তে আস্তে অকার্যকর হয়ে পড়ে। তারা পঞ্চায়েতের দায়িত্ব খর্ব করে এদেশে এক শ্রেণীর জমিদার সৃষ্টি করেন। স্থানীয় এলাকার যাবতীয় দায় দায়িত্ব এই জমিদার শ্রেণীর উপর অর্পিত হয়। নতুন জমিদাররা রাজস্ব আদায় ও শান্তি শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব পান। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ

গ্রাম বাংলার আইন শৃংখলার পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি হতে থাকে। তাই আইন শৃংখলা পরিস্থিতি উন্নয়নের জন্য ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়োর (Bengal Village chowkidary, 1870) বেঙ্গল ভিলেজ চৌকিদারী এ্যাক্ট, ১৮৭০ পাশ হয়। এই আইনের ধারা অনুসারে গ্রাম এলাকায় পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট্য পঞ্চায়েত গঠিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিল শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা এবং গ্রামবাসীর নিকট হতে চৌকিদারী কর আদায় করা। চৌকিদারী পঞ্চায়েত গ্রামবাসীর দ্বারা নির্বাচিত কিংবা মনোনীত ছিলেন না। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছিল অচিরেই তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কারণ চৌকিদারী খাজনা সম্পদ ও সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে আদায় করা হতো যা সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাছাড়া এর সদস্য মনোনয়ন পদ্ধতিও ছিল দুর্বল প্রকৃতির। এ সব কারণের জন্য ১৮৭০ সালের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। পরবর্তীতে ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্বায়ত্তশাসন আইন পাশ করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো তৈরি করা হয়, যথা (১) জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড, (২) মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড (৩) কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে ইউনিয়ন কমিটি। এই আইন অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচনের মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। জনগণের ভোটে ৫ থেকে ৯ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন কমিটি ২ বছরের জন্য গঠিত হতো। ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল সে অনুসারে অর্থ প্রদান করা হয়নি। ইউনিযন কমিটির উপর ছিল জেলা বোর্ডের প্রভুত নিয়ন্ত্রণ। তাই স্বাধীনভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় সরকারকে অধিকতর কার্যকর করার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হতে থাকায় ১৯১৮ সালে মন্টেগু চেম্‌স ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে বেঙ্গল ভিলেজ সেল্ফ গভর্ণমেন্ট আইন, ১৯১৯ জারী করা হয়। এই আইনের মাধ্যমে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটিকে একীভূত করা হয় এবং নামকরণ করা হয় ইউনিয়ন বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ড ছয় জন থেকে নয় জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হতো। এ সব সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ জেলা প্রশাসকের মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য নির্বাচনের এই পদ্ধতি ছিল অগণতান্ত্রিক মুলতঃ এই সময় থেকেই গ্রাম বাংলার মানুষ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারী করা হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে ৪ স্তরে রূপ দেয়। এগুলো হচ্ছে ইউনিয়ন কাউন্সিল থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল। গড়ে ১০ হাজারের মত লোক বসবাস করে এমন এলাকা নিয়ে

ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠিত হতো। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ১৫ জন। মোট সদস্য সংখ্যার ৩ ভাগের ২ ভাগ ইউনিয়নবাসী নির্বাচিত করতেন। বাকী ১ ভাগ সরকার মনোনয়ন দিত। এলাকার শক্তি শৃংখলা রক্ষার পাশাপাশি ইউনিয়ন কাউন্সিল ৩৭টি কার্যাবলী দেখাশোনা করতেন। এসময় সরকারী কর্মকর্তাগণ বিভিন্নভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতো।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের ৭ নং আদেশ দ্বারা মৌলিক গণতন্ত্র রদ করা হয়। সে বছরই রাষ্ট্রপতি ২২ নং আদেশ দ্বারা "ইউণিয়ন পঞ্চায়েত" ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গুলি রিলিফ কমিটির স্থলাভিষিক্ত হয়। ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারী থেকে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়। পঞ্চায়েতের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একজন চেয়ারম্যান এবং কয়েকজন সদস্য মনোনীত হতেন। ১৯৭৩ সালের ২২ মার্চ রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২ দ্বারা ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন পরিষদ রাখা হয়।

এই পরিষদের ৯ জন সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হত। একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে মোট ১১ সদস্যের ইউনিয়নকে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। এই ইউনিয়ন পরিষদ সার্কেল অফিসারের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতো। ১৯৭৬ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারীর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে ৩টি স্তরে বিভক্ত করা হয়। যথাঃ (১) ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ (২) থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ (৩) জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। এই অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান এবং ৯ জন মেম্বার সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৭৬ সালের পর ১৯৮৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোতে আবারও সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ প্রবর্তনের ফলে এই পরিবতৃন আনা হয়। অধ্যাদেশ অনুযায়ী জনগণের সরাসরি ভোটে একজন চেয়ারম্যান এর পুরনো প্রতি ওয়ার্ড থেকে তিন জন করে মোট নয় জন নির্বাচিত মেম্বার এবং তিন জন মনোনীত মহিলা মেম্বার নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ (সংশোধনী) আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। এই আইন অনুযায়ী প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে মোট নয় জন মেম্বার ও একজন চেয়ারম্যান সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং পূর্বের

মতোই তিনজন মহিলা মেম্বার মনোনীত হবেন। ৯৩ সালে এ আইন পাশ হলেও তা আর কার্যকর হয়নি।

ইউনিয়ন পরিষদের সর্বশেষ পরিবর্তন ঘটে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এখানে চেয়ারম্যানসহ সাধারণ আসনে নয় জন নারী পুরুষ এবং সংরক্ষিত আসনে তিন জন নারী সদস্যসহ তের জন নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। এখানে সংরক্ষিত আসনে নারীদেরকে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত করার বিধান করা হয়। এই পরিবর্তিত কাঠামো বর্তমানে বহাল রয়েছে।

সরকার বিভিন্ন সময় অধ্যাদেশের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের উন্নতির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের হাতে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন। বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদগুলো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। এর মূল কারণ হল কেন্দ্রীয় সরকারের অতি নিয়ন্ত্রণ, আমলাতান্ত্রিক ভিধি ও নিয়মাবলী, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সীমিত পরিমান অর্থের বরাদ্দ করণ, ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া এবং প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত বিষয়ের সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদ দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবে না।

আমার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত ঢাকা জেলার তেজগাঁও সার্কেলের অধীন দক্ষিণগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও সাধারণ জনগণের উপর সমীক্ষা চালানো হয়। পরিষদ সদস্যদের সমীক্ষায় দেখা যায় যে-

১। পরিষদের কাজে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা পরিষদের কাজে বাধা সৃষ্টি করছে।

২। থানা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করে না।

৩। পরিষদ সদস্য ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হলো স্থানীয় সংসদ সদস্য তাদের প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৪। সরকারী অনুদান ইউনিয়ন তহবিলে সরাসরি প্রেরিত না হওয়ায় পরিষদ নিজের ইচ্ছে মতো প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারে না।

৫। প্রয়োজনের তুলনায় সরকারী অনুদান সামান্য প্রেরিত হওয়ায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না।

৬। ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয়ের উৎস খুবই সীমিত।

৭। পরিষদ সদস্যদের সম্মানী বর্তমানে যা দেওয়া হয় তাতে পরিষদ সদস্যরা সন্তুষ্ট নয়।

৮। ইউনিয়ন পরিষদে পুরানো ম্যানুয়াল অনুসৃত হয়। পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের পৃথক তালিকা নেই। বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে নারী সদস্যদের কাজের আলাদা তালিকা তৈরী হলেও পরিষদ কর্মকর্তারা তা হাতে পাননি।

৯। পরিষদের পুরুষ সদস্যরা সাধারণতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ও নারী সদস্যরা সমাজ কল্যান সংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

১০। সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যরা বিভিন্ন ভাবে বৈষম্যের স্বীকার হন।

১১। তিনটি ওয়ার্ড হতে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের এলাকার উন্নয়নের জন্য যা বরাদ্দ দেওয়া হয় তা যথেষ্ট নয়।

১২। পরিষদের বেশীরভাগ সদস্যের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১ম শ্রেণী হতে এইচ,এস,সি'র মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ইউনিয়নের স্থানীয় জনগণের মতামত জরীপ সমীক্ষায় দেখা যায় যে-

১। ইউনিয়ন পরিষদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পরিষদ সদস্যরা তা সঠিকভাবে পালন করে না।

২। পুরুষ সদস্যরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ও মহিলারা সমাজ কল্যান সংক্রান্ত কাজ করে।

৩। ইউনিয়নের সাধারণ জনগণের উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা একেবারেই কম।

৪। অধিকাংশ মতামত প্রদানকারী মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলেছেন।

৫। মহিলা সদস্যরা নিরাপদে তাদের দায়িত্ব পালন করেন এবং তাদের সহযোগিতা করার জন্য জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৬। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে পারিবারিক, সামাজিক ও নিরাপত্তার অভাব সাধারণ জনগণ প্রধান প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করেন।

৭। ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য সরকার যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ দেয় তা সঠিক ভাবে ব্যয় হয় না। উন্নয়নের জন্য সরকারকে আরো অধিক অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

৮। পরিষদ সদস্যদের সম্মানী যা দেওয়া হয় তা তারা যথেষ্ট বলে মনে করেন না।

৯। ইউনিয়নে এনজিওদের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হবার ফলে আয় বৃদ্ধি, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্য সেবায় মান উন্নয়ন হচ্ছে।

১০। গ্রাম সরকার গ্রাম উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে না।

আলোচ্য গবেষণায় তৃণমূল পর্যায় বলতে প্রশাসনের নিম্ন স্তর অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদকে বুঝানো হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ দেশের একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে মানুষের রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক তৃণমুল পর্যায়ে অর্থাৎ গ্রামে বাস করে। তাই তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চায় কিংবা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সর্বনিম্ন সোপান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। সারা দেশে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে বা স্থানীয় সংস্থা গঠিত হয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত সদস্য ও চেয়ারম্যানদের নিয়ে। নির্বাচিত সদস্যরা ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারা স্বাধীনভাবে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে না।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রধানতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো স্থানীয় এলাকর জনগণের অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের উন্নয়ন ও নানাবিধ কল্যান সাধন, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং জনগণের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভূমি কর ও রাজস্ব আদায়ে এবং সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান ছাড়াও স্থানীয় জনগণের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানবিক উন্নয়ন সহ এলাকার সামগ্রীক উন্নয়নে অবদান রাখা ইউনিয়ন পরিষদের বড় দায়িত্ব।

বাস্তবে ইউনিয়ন পরিষদ জনগণের উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখছে না। এর প্রধান কারণ হলো পরিষদগুলোকে সরকার ও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করতে হয়। পরিষদের আয়ের উৎস সীমিত হওয়ায় ও অর্থনৈতিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারে না। তাই জনগণ এখানে ভালো সেবা হতে বঞ্চিত হয়।

বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হলে স্থানীয় সংস্থা সমূহকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা বন্ধ করে এর পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে। পরিষদগুলোকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য সরকার যে সব আয়ের উৎস ইউনিয়ন পরিষদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। ইউনিয়ন পরিষদের আয়ের উৎস

সীমিত হলে জনগণের কল্যানের জন্য ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব নয়। সেজন্য ভূমি রেকর্ড, রেজিষ্ট্রেশনের দায়িত্ব ইউপির হাতে দিয়ে ট্রান্স বা খাজনা আদায়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ পরিষদ সদস্যদের দেওয়া হলে পরিষদের আয় বাড়বে। অন্যদিকে সরকারী অনুদান পরিষদ তহবিলে সরাসরি প্রেরণ করা হলে পরিষদ সদস্যরা স্থানীয় জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। কারণ স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরাই স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে অধিক সচেতন।

বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ যে সব আইনের সমন্বয়ে পরিচালিত সে আইনগুলি নির্দিষ্ট ভাবে নেই। সেজন্য কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ জন্য লোকাল গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট গুলি ঠিক করা দরকার। পাশাপাশি পুরানো ইউনিয়ন পরিষদ ম্যানুয়াল হালনাগাদ করে সদস্যদের কাজের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে হবে। এছাড়া আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ সকলের ক্ষমতা প্রয়োগের সীমারেখা নির্ধারিত করা উচিৎ। যাতে করে কেউ কারো কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। পরিষদের নারী সদস্যরা যাতে পরিষদের সকল কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। এ জন্য পুরুষ সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হবে। পাশাপাশি ইউনিয়নের জনগণকে মহিলা সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়া দরকার।

বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক নারী নির্বাচনে অংশগ্রহন করছে ও জয়ী হয়ে পরিষদের দায়িত্ব পালন করছে। তবে মুষ্টিমেয় কিছু নারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই নারীর ক্ষমতায় হয় না। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অধিক হারে কর্মে নিয়োগের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরনের সম্পদ যেমন বস্তুগত, মানব, সামাজিক সম্পদে মহিলা প্রধান পরিবারের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্ত করতে চাইলে আর্থিক, অকাঠামোগত সমস্যা দূর করা ছাড়াও নারী শিক্ষার বিষয়টি সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে হবে।

সরকার এবং এনজিও'র প্রচেষ্টায় দেশের একেবারে শেকড় পর্যায়ে মানুষের মধ্যে নানাবিধ সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুরোনো ধ্যান ধারনা বাদ দিয়ে মানুষ নতুনের প্রতি আগ্রহবোধ করছে। আজীবন ভাগ্যের উপর নির্ভর করে নিজের দরিদ্র অবস্থাকে মেনে নিত যে জনগণ, তাদের অনেকেই আজ নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য উদযোগী হয়েছেন। অর্থাৎ তাদের ভেতরে সঞ্চারিত হয়েছে

উন্নয়ন আকাঙ্খার। বাংলাদেশের এনজিওসমূহের কর্মকান্ডের অনেক আলোচনা-সমালোচনা সত্ত্বেও তাদের সবচে বড় সাফল্য হচ্ছে তারা গ্রাম বাংলার মানুষদের ভাল জীবনের স্বপ্ন দেখাতে পেরেছেন। আর এর ফলেই গ্রাম বাংলায় সামান্য হলেও পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তনের ধারা ধরে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে জনগণের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেসরকারী সংগঠনগুলোর কর্মকান্ডে আরো গতিশীলতা আনার জন্য তাদের সমস্যার সমাধানে আন্তরিক হতে এবং তাদের ভাল কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে এর ভূমিকা রাখতে হবে এনজিও সমুহের।

ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সরকারের কাঠামো, অস্তিত্ব সবই ভিন্ন। তারা একই সাথে কাজ করতে গিয়ে কখনও যদি ক্রোন্দলের সৃষ্টি হয় তবে গ্রামবাসীর জন্য তা হবে চরম বিপর্যয়কর। সে জন্য দুটি প্রতিষ্ঠান সহাবস্থানের ভিত্তিতে গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে তার নতুন দায়িত্ব সুন্দর ভাবে বুঝে নিতে হবে। তিনি এখন গ্রাম সরকার ব্যবস্থার মধ্যেমনি। তার প্রধান কাজ হবে সারা ইউনিয়নে উদ্যম সৃষ্টির জন্য সকল গ্রাম সরকার প্রধানের মধ্যে । বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া। তিনি গ্রাম সরকার প্রধানের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করলে মারাত্মক ভুল করবেন। তাকে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে এবং সহকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এ ভাবে গ্রাম সরকার প্রধানদের নিয়ে একসাথে কাজ করলে তার পূর্বের ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি, বেসরকারী নানা সেবাদনকারী প্রতিষ্ঠান/ সংগঠন আছে। এর পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক বিভিন্ন কমিটি। এসব প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যেমন শিক্ষা, কৃষি, চিকিৎসা, ঋণ, সচেতনতা, কর্মসংস্থান, আইন শৃঙ্খলা, রক্ষাসহ নানা রকম সহায়তা প্রদান করে তেমনি সামাজিক কমিটিগুলো বিভিন্ন রকম নাগরিক সমস্যা সমাধানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। একটি ইউনিয়নের এ সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সামাজিক কমিটি যদি সক্রিয় থাকে তবে অনেক সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান ও উন্নয়নের পথে অন্তরায়সমূহ অতিক্রম করা সম্ভব হবে। আর তাই সেবাদানকারী এই সংগঠনগুলোকে আরও বেশী সক্রিয় করা দরকার। এ জন্য প্রয়োজন নাগরিক বা সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আমাদের দেশের গ্রামগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে অবকাঠামো উন্নয়নের দিকে নজর দিতে হবে। দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নিজস্ব অফিস ভবন নেই। ভাড়া করা বাড়িতে পরিষদের কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয় তাই প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য নিজস্ব পরিষদ ভবন

স্থাপন করে জীর্ণ শীর্ণ চেহারাটা পাল্টিয়ে ফেলতে হবে। পাশাপাশি গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ করতে হবে। গ্রামের রাস্তাঘাট তেমন সুবিধাজনক নয়। সেজন্য ইউনিয়নের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। অন্যদিকে গ্রামগুলির স্কুল, কলেজ সংস্কার করে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। নতুবা নারী পুরুষের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না।

পরিশেষে বলা যায় গ্রামীণ এলাকার সুশাসন নিশ্চিত করা, জনগণের সেবা প্রদান ও এলাকাভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সচল রাখার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের গুরুত্ব ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ঐতিহ্যগত ইউনিয়ন পরিষদসমূহের যে সকল আবশ্যিক করনীয় রয়েছে, তার সাথে বর্তমান সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনের আলোকে নতুন নতুন কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন জরুরী হয়ে পড়েছে। এ ধরনের বিষয়ের মধ্যে রয়েছে ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা, দারিদ্র্য বিমোচন ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়ন, সকল শ্রেণীর নারী সমাজের উন্নয়ন ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। অর্থাৎ পুরাতন দায়িত্ব এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নতুন দায়িত্বসমূহ পালনের জন্য একবিংশ শতাব্দীর ইউনিয়ন পরিষদকে প্রস্তুত হতে হবে। এই প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী হতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

অনীক, (১৯৮৬); গ্রাম উন্নয়ন চাই আদর্শবাদ, দৈনিক সংবাদ, ১৬ জুন, ঢাকা।

আখতার, তাহমিনা; (১৯৯৫); মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আজাদ, মোঃ আবুল কালাম (২০০৩) "ইউপি নির্বাচন ও আচরণ বিধিমালা" ভোরের কাগজ, ২৬ জানুয়ারী, ঢাকা।

আমিনুজ্জামান; (২০০৪); ডঃ সালা উদ্দিন, এম; বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া ও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার, দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৬ অক্টোবর, ঢাকা।

আহমদ, অধ্যাপক এমাজউদ্দীন; (১৯৮০); বাংলাদেশ লোক প্রশাসন, গোল্ডেন বুক হাউজ, ঢাকা।

আলী, মুহাঃ ইয়াসিন; (১৯৯৯); "দারিদ্র বিমোচন ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার ভূমিকা" Journal of local government vol-28,No-1 জানুয়ারি-জুন, ঢাকা।

আলম, এম খোরশেদ; (১৯৯৭); পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই উন্নয়ন, উন্নয়ন বিতর্ক; বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা।

আসাদুজ্জামান, মোঃ; (১৯৯৯); প্রচলিত প্রশাসন কাঠামো ও সিস্টেমের রূপান্তর প্রেক্ষিতঃ বাংলাদেশ, কাশবন প্রকাশন, ঢাকা।

আহমেদ, ডঃ তোফায়েল (২০০৩); "ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের পরবর্তী কাজ" দৈনিক ইত্তেফাক, ১ জানুয়ারী, ঢাকা।

ইউনুস, ডঃ মুহাম্মদ; (২০০৩); গ্রাম সরকার নিয়ে কিছু কথা, প্রথম আলো, ৪ নভেম্বর, ঢাকা।

ইসলাম, জহিরুল; (২০০২); "বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য দরকার শক্তিশালী স্থানীয় সরকার" আজকের কাগজ, ২ নভেম্বর, ঢাকা।

ইসলাম, মোঃ খাদেমুল; (২০০২); সংবাদপত্রে জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সংবাদ; রাজশাহীর সংবাদপত্রের উপর একটি সমীক্ষা, আইবিএম জার্নাল, ৯ম সংখ্যা।

কাদির, সৈয়দা রওশন; (১৯৯৪); "স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া; সমস্যা ও সম্ভাবনা" নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন,ঢাকা।

খোকন, রফিকুল ইসলাম ও রতন সরকার (২০০২); "ইউনিয়ন পরিষদ ও জনপ্রতিনিধিদের নাগরিক দায়িত্ব" রূপান্তর, খুলনা।

খান, মিজানুর রহমান; (২০০২); "ইউপি নির্বাচনঃ নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতা দিন, দৈনিক যুগান্তর, ঢাকা।

খান, মোঃ মহব্বত; (১৯৯২); "বাংলাদেশে স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের স্বায়তশাসনঃ একটি মূল্যায়ন" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪৪, অক্টোবর।

চাষী, মাহবুব আলম; (১৯৮১); "স্বনির্ভর গ্রাম সরকার" দৈনিক দেশ, ১২ জানুয়ারি, ঢাকা।

চৌধুরী, নাজমা; (১৯৯৭); রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ; প্রান্তিকতা ও ভাবনা নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত নারী ও রাজনীতি, উইমেন ফর উইমেন।

জলি, নাসিমা আক্তার; (২০০৪); নারী উন্নয়নে গৃহীত জাতীয় পদক্ষেপ সমূহ, বাংলাবাজার পত্রিকা, ঢাকা।

জাহান, সেলিম; (১৯৯৮); প্রসঙ্গঃ উন্নয়ন পরিকল্পনা, ঢাকা; সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

ঠাকুরতা, গুহ মেঘনা ও বেগম, সুরাইয়া; (১৯৯৬); "রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন; প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, সমাজ নিরীক্ষণ, নভেম্বর, ঢাকা।

নূর, আব্দুর; (২০০০) পরিকল্পনা ও উন্নয়নঃ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ, কেন্দ্র।

নাসরিন, ডঃ মাহবুবা; (২০০); "উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সমন্বয়" সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ডেমোক্রেসি ডায়ালগ, মার্চ ৩, ময়মনসিংহ।

মজুমদার, ডঃ বদিউল আলম (২০০৩) স্থানীয় সরকার বিষয়ে গৃহীত অনেক সরকারী পদক্ষেপ সংবিধানের পরিপন্থী, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা।

মাসদিত, খুনিইং সুপাত্র; (১৯৯৭); "নারীরা কেন রাজনীতি করবে" উন্নয়ন পদক্ষেপ, এপ্রিল-জুন, সংখ্যা-৮, ঢাকা।

মিয়া, মোহাম্মদ ফিরোজ ও আলম, এস আলম; (১৯৯৬); "বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন, রোদ্দুর, ঢাকা।

রহমান, আতিউর; (১৯৮৮) গ্রামীণ মানুষের দৃষ্টিতে ক্ষমতা কাঠামোর স্বরূপ আতিউর রহমান, সমাজ নিরীক্ষণ, ফেব্রুয়ারী, ঢাকা।

রশীদ, হারুন-অর; (১৯৯৬); বাংলাদেশের এনজিও, প্রগতি প্রকাশন, ঢাকা।

রহমান, এম হাবিবুর; (১৯৯৯); সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রেহমান, তারেক শামসুর; (২০০); "সম্পাদিত, বাংলাদেশঃ রাষ্ট্র ও রাজনীতি, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

রহমান, মোঃ মকসুদুর; (১৯৮৮); বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশন বোর্ড, ঢাকা।

রহমান মোঃ হাবিবুর, সিদ্দিকী, নুরে আলম; (১৯৯৭); স্থানীয় গণতন্ত্রের বাহন হিসাবে বিকেন্দ্রীকরণঃ একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সমাজ নিরীক্ষণ, নভেম্বর, ঢাকা।

লাহিড়ী, চন্দ্রন কুমার; (২০০৩); "ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকলের যা অঙ্গীকার হওয়া উচিৎ" দৈনিক ইত্তেফাক, ১৮ জানুয়ারী, ঢাকা।

শেলী, মিজানুর রহমান; (১৯৯৬); "এনজিও বিতর্ক": হাওয়াই ঝগড়া, দৈনিক সংবাদ, ঢাকা।

সিদ্দিকী, কামাল; (১৯৮৬); বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্রের স্বরূপ ও সমাধান, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা।

হোসেন, আবিদ; (১৯৮৯); বৃটিশ শাসনামলে স্থানীয় সরকার, সিদ্দিকী কামাল সম্পদিত, এন,আই,ইন,জি, ঢাকা।

হোসেন, আমির; (২০০৩); উপজেলাসহ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হবে, দৈনিক সংবাদ, ১৬, নভেম্বর, ঢাকা।

হাসান, আহমদ সামিয়াল; (২০০০); "গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকার ও উপজেলা পদ্ধতি"- একটি পর্যালোচনা, সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ২৫, ঢাকা।

সিদ্দিকী, নাজমা; (২০০২); "বিশ্বায়ন প্রেক্ষপটে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন" এশিয়াটিক সোসাইটি, বিংশখন্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা।

হক, আবুল ফজল; (১৯৭৪) " বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

হক, আঃ নঃ সামসুল; (১৯৮২); গ্রামীন উন্নয়ন; বিকেন্দ্রীকরণ ও ফিল্ড প্রশাসন" মোঃ আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, লোক প্রকাশন ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, চট্টগ্রামঃ লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী

Ahamed, Emajudding; (1978) Bureaucratic Elite in Bangladesh and their Development orientation", Dhaka: Dhaka University studies, Vol-XXVIII (June).

Ahmed, Azad; (1958); Development Through Upazila; Problems and Prospects. "The Journal of the Local Government. NILG. Vol. No. 1.

Ahmed, Nafis; (1964). An Economic Geography of East Pakistan, London; Oxford University Press. Ali Shaikah Masood (1971) sense and senibility of a swanirvar Gram Sarker Format for Rural Development" Administrative science Review, Dhaka: NIPA, Vol IX, No. 2.

Alderfer, H; (1974); Local Government in Development countries, New York: MC Graw. Hill.

Ankie, M.M; & Hoogvelt (1988) The sociology Developing societies, Macmillan Education Ltd. London.

Bertocci, peter. j; (1982); Bangladesh in the Early 1980s: Praetorian Politics in an Intermediate Regime, Asian Survey, Vol, XXII, No. 10.

Bhogle, S.K; (1977; Local Government and Administration in India. Parimal Prakashan. Aurengabad.

Bryce, Lord Jamce; (1922); Modern Democracies, Vol I.

Chaudhury, Muzaffar Ahmed; (1968); District Board, in Bengal and East Pakistan". Administrative Science Review, Vol-II, No. 4, December.

Chowdhury, Lutful Haq; (1987) "Local Self Government and its Reorganization in Bangladesh" I.T.G. Dhaka.

Clarke, J; (1960) Out lines of Local Government of United Kingdom, London; Sir ISSAC Pitman and sons Ltd.

Dhaka University Institutional Repository

Gopal. S, (1953); The vice Royalty of Lord Ripon-1880-1884 London: Oxford University Pres.

Haq Nurul; (1973); Village Development in Bangladesh. (Comilla: BARD)

Hasluck, EL; (1948) Local Government in England, Cambridge.

Hicks, Ursulak. K; (1961) Development from below: Local Government & Finance in Developing countries @ the commonwealth Oxford Clarinda press.

Huda, Dr. Khawja shamsul; (1984); The Role of NGO's in Bangladesh Development, Bangladesh Development Dialogue Journal SID, Bangladesh Chapter, Dhaka.

Inayatullah; (1964); Basic Democracies: Administration and Development, Pakistan Academy for Rural Development, Peshwar.

Jahan Rounaq; (1972); Pakistan: Fiailure in National Integration, Columbia University Press, New York.

Kabeer, Rokeya Rahman; (1965) Administrative policy of the Government of Bengal (1870-1890). Dacca; NIPA. Part II.

Khan; Muhammad Ayub Building of a Free Nation, Basic Democracies. Speeches and statements, Islamabad: N.D. Vol.1

Laswell, H & Kaplan, K; (1950), Power and Society: A Framework for social Enoviry, New Haven, Coon.

Lindzay G.W. Allo ront; (1975); Grounder and Elliot Aronson (ed); The Hand book of social psychology" Volume-two. Research Methods, New Delhi: Amerind Publishins co. Pvt. Ltd.

Dhaka University Institutional Repository

Mahatab, Najmulnnesa; (1978); Local Government in France and Bangladesh: A descriptive analysis of Executive Action, Dacca University.

Mellema, R.L; (1961); Basic Democracies system in Pakistan. Asian Survey, Vol. 1, No. 6.

Miah, Ahmadullah; (1976); Problems of Rural Development; Some Household Level Indicators" (Dacca: statistics Research and Evaluation Division, IRDP.

Myrdol, Gunner; (1972); Asian Drama: An Inquiry in to the poverts of Nations A bridged, Lund: Allen lane penguire press.

Nijam, S.R; (1975); Local Government, New Delhi: S. Chand and Co.

Padron, merio; (1997); "Non-Governmental Development Organizations From Development Aid to Development Co-operation". Oxford: World Development Vol. 15. Supplement.

Palombara, Joseph La; (1963); An overview of Bureaucracy & Political Development; New Jersy; Princeton University.

Polansky, Norman A; (ed) (1960); Social work Research, The University of Chicago press illionis.

Polantzas, N; (1986); 'Class power' in staven Luke (ed) power, New York, University of Press.

Quareshis, I.H; (1966); Administration of the mughal Empire. Karachi: The University of Karachi.

Rahman, A.H.M. Aminur; (1990); Politics of Rural Local Selp. Government in Bangladesh, Dhaka; University of Dhaka.

Raper, Arthur F; (1970); Rural Development in Action, London: Cornel University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Rashiduzzaman. M; (1968); Politics and Administration in Local Council; a study of union and district councils in East-Pakistan, Dacca: Oxford University Press.

Rondinelli, D.A and G.S. Cheema; (1983); Implementing Decentratization policies; An Introduction" in G.S. Cheema and D.A. Rondinelli (eds). Decentralization and Development, sage. Beverly Hills.

Rostow, W.W; (1960); The stage of Economic Growth: A Non communist Manifesto, Cambridge, mass.

Roy, N.C; (1936); Rural self. Government of Bengal. Calcutta: Calcutta University Press.

Sarker, Sir Jadunath; (1952); Mughal Administration. Calcutta. Sarker and sons Ltd.

Siddique, Kamal; (1992); Local Government in South Asia; a Comparative Study, Dhaka University Press Limited.

Sing, Naresh; Tiji, Vangle; (1995); Empowerment: Towards sustainable Development. Zed Books Ltd; London.

Tarachand; (1961); History of the Freedom Movement in India. New Delhi; Ministry of Information.

Tawney, R.H; (1952); Equality, London: Allen Lane.

Tocqueville, Alexis De; (1945); Democracy in America, Vol.1.

Uphoff, N.T; (1985); Local Institutions and Decentratization for Development" In H.A. Hye(ed) Decentralisation. Local Government institutions and Research Mobilization. Bangladesh Academy for Rural Development, Comilla.

Weber, M; (1960); The Theory of Social and Economic Organization, Glencoe.

White, L.D; (1939); Introduction to the study at public Administration New York; Macmillan and company.

Dhaka University Institutional Repository

Public Document

Government of Bengal; (1870); The calcutta Gazelle, Calcutta: Bengal Secretarial Press, (9 March)

(1885); Bengal code Act III. Calcutta; Government Press.

Government of Pakistan; (1959), "Basic Democracies order," in the Gazette of Pakistan. (Extra-ordinary), Karachi, 27 October.

Government of Bangladesh (1972) Bangladesh Local Council and Municipal Committee (Dissolution and amendment) order, (20 January).

(1973) The Bangladesh Gazette Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (30 June).

(1980) The Bangladesh Gazette (Extra ordinance), Dhaka, 24 May.

(1982) Government of the People's Republic of Bangladesh, Ordinance No. LIX, Article 28.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা।

(এম,ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকারঃ (সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর সম্পূর্ণ গোপণীয়তা রক্ষা হবে)

১। অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন ----------

২। আপনার বর্তমান বয়স কত বলুন ----- বছর

৩। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন -------

৪। আপনার বর্তমান মাসিক আয় কত-------- টাকা

৫। আপনার পেশা সম্পর্কে বলুন ---------

৬। আপনি কোন ইউনিয়নে/গ্রামে বসবাস করেন?

৭। আপনি এ ইউনিয়নে কত বছর যাবত বসবাস করছেন? --------

৮। আপনার ইউনিয়ন থেকে নিকটবর্তী শহর কতদূর ------------ মাইল।

৯। আপনার স্ত্রী-পুত্র কোথায় থাকে? গ্রাম / শহরে।

১০। আপনি কত বছর যাবৎ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ------বছর।

১১। আপনি আপনার পরিষদের কার্যালয়ে দিনে কতবার যান? -------বার।

১২। আপনি স্থানীয় পরিষদ অর্থাৎ শুধু ইউনিয়ন পরিষদেরই একজন চেয়ারম্যান নন; আপনি অত্র এলাকার জনগণের অভিভাবক- এলাকার উন্নয়নে আপনি কিকি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

১৩। আপনার এলাকার উন্নয়নে এসব পদক্ষেপ কতটুকু যুক্তিযুক্ত উন্নয়নের স্বার্থে জবাব দিন?

১৪। আপনি যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি সেহেতু এলাকার সমস্যা সম্পর্কে আপনিই সবচেয়ে বেশী সচেতন- এ সমস্যা সমাধানে আপনার উদ্যোগের পর সরকার ও প্রশাসন থেকে আপনি কি কোন সহযোগিতা পান? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কোন ধরণের সহযোগিতা ঃ ---------

না হলে কেন না? ----------

Dhaka University Institutional Repository

১৫। আপনি কি মনে করেন পরিষদ সংক্রান্ত সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো সঠিক? হ্যাঁ / না।

১৬। আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য?

১৭। আপনি আপনার এলাকাবাসীকে কিভাবে সাহায্য করেন?

১৮। ইউনিয়ন পরিষদের সভা মাসে কয়বার করেন? ------- বার এ সভায় সাধারণতঃ কিকি বিষয়ে আলোচনা হয়?

১৯। আপনি কি মনে করেন আপনাকে যে ক্ষমতা সরকারীভাবে দেয়া হয়েছে তা যথেষ্ট? হ্যাঁ / না।

না হলে আপনার প্রস্তাব কি? --------

২০। ইউনিয়ন পরিষদকে আরো শক্তিশালী করতে হলে কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?

২১। ইউনিয়ন পরিষদ অর্থনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল কি? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ, হলে এই নির্ভরশীলতা কিভাবে কমানো সম্ভব? এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

২২। ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বছরে যে জাতীয় বাজেট তৈরী হয় তা দিয়ে কি জনকল্যাণ সম্ভব? হ্যাঁ/না।

না হলে আপনার সুপারিশ কি? ---------

২৩। ইউনিয়ন পরিষদ কাঠামোর মধ্যে কি কি দূবর্লতা রয়েছে?

২৪। যে সব আইনের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হয় সেখানে কোন ধরণের আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে কি? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরণের ---------

২৫। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সম্পর্কে দূর্নীতির অভিযোগ ওঠে কেন?

২৬। আমাদের দেশের জন্য কয় স্তর বিশিষ্ট্য স্থানীয় সরকার হওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন ---------

২৭। পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্য হস্তক্ষেপ করে কি? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরণের ---------

২৮। আপনার মতে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে জনগণের ধারণা কেমন? ভালা / ভালা না / স্পষ্ট বোঝা যায় না / আমাদের কাছে প্রকাশ করে না।

২৯। ইউনিয়ন পরিষদের হাতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড, খাজনা আদায় ও রেজিষ্ট্রেশনের দায়িত্ব দেয়া যায় কি? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কেন --------

Dhaka University Institutional Repository

৩০। ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারী ক্ষমতা কিভাবে চর্চা করা হয়? প্রশাসনিক / অর্থনৈতিক / রাজনৈতিক।

এসব নিয়ন্ত্রন পরিষদের সাজে কি কোন ক্ষতি করে? --------

৩১। সরকার কেন্দ্র থেকে সরাসরি আর্থিক সাহায্য প্রদান করলে সুবিধা হতে কি? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরণের? ---------

৩২। ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ব্যবস্থা সুফল বয়ে আনবে কি? হ্যাঁ / না।

৩৩। বলা হয় ইউনিয়ন পরিষদ স্বায়ত্বশাসিত। বাস্তবে কতটা স্বায়ত্বশাসিত? সত্যিকার অর্থে স্বায়ত্বশাসিত / শুধু কাগজে কলমে / আরো স্বায়ত্বশাসিত হওয়া উচিত।

সাক্ষর ঃ

ধন্যবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা।

(এম,ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যদের সাক্ষাৎকারঃ (সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর সম্পূর্ণ গোপণীয়তা রক্ষা হবে)

১। অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন ----------

২। আপনার বর্তমান বয়স কত বলুন ----- বছর

৩। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন -------

৪। আপনার বর্তমান মাসিক আয় কত--------- টাকা

৫। আপনার পেশা সম্পর্কে বলুন ---------

৬। আপনি কোন ইউনিয়নে/গ্রামে বসবাস করেন?

৭। আপনার ওয়ার্ডে ভোটার সংখ্যা কত? (ক) পুরুষ --------- (খ) মহিলা --------

৮। আপনার ইউনিয়নের ভোটারগণ কি স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে? হ্যাঁ / না।

৯। আপনি পরিষদ নির্বাচনে কত ভোট পেয়েছিলেন? -------------

১০। আপনার সাথে মোট কতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল? -----------

১১। নির্বাচনের সময় আপনি কি কি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন? ----------

১২। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসাবে আপনি কি কি দায়িত্ব পালন করেন?

১৩। আপনার ওয়ার্ডসহ তিনটি ওয়ার্ড থেকে একজন মহিলা সদস্য থাকেন। তাকে কি আপনি আপনার কাজের সাথে জড়িত করেন? হ্যাঁ / না।

১৪। আপনি কি মনে করেন বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন থাকার প্রয়োজন আছে? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কারণ কি? ----------

না হলে কারণ কি? ----------

১৫। ৩টি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হওয়ার কারণে তারা কি কোন প্রভাব খাটাতে চায়? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরণের? -----------

Dhaka University Institutional Repository

১৬। আপনি কি মনে করেন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন ও দলীয় ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ? ------------

১৭ মহিলা সদস্যরা কি পরিষদের সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন? -------

১৮। কাজ করার সময় মহিলা সদস্যরা কি নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন? -------

১৯। আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য? হ্যাঁ / না।

২০। আপনি কি মনে করেন জাতীয় নির্বাচনের মত স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হওয়া উচিৎ? --------

২১। আপনি কি মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদ সংক্রান্ত সরকার গৃহীত পদক্ষেপগুলো সঠিক? হ্যাঁ/না।

না হলে আপনার মতামত কি? ------

২২। যে সব আইনের সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালিত হয় সেখানে কোন ধরণের আইনি পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে কি? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরণের ---------

২৩। পরিষদের কাজে স্থানীয় সংসদ সদস্য হস্তক্ষেপ করে কি? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের----------

২৪। সরকার কেন্দ্র থেকে সরাসরি ইউপিতে আর্থিক যাতাকে প্রদান করলে সুবিধা হবে কি? হ্যাঁ/না

হ্যাঁ হলে কি ধরণের ---------

২৫। ইউনিয়ন পরিষদের শক্তিশালী করতে হলে কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে? ------------

২৬। সু-শাসন নিশ্চিত করতে ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে বর্তমান শাখা ব্যবস্থা সংকটের মুলে কি কি কারণ রয়েছে?--------

২৭। বর্তমানে যে পরিমাণ ভাতা পরিষদ সদস্যদের দেওয়া হয় তাকি আপনি যথেষ্ট মনে করেন? হ্যাঁ/না।

না হলে আপনার সুপারিশ কি? ---------

২৮। ইউনিয়ন পরিষদের আয় কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়? --------

স্বাক্ষর ঃ

ধন্যবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা।

(এম,ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্যদের সাক্ষাৎকারঃ (সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর সম্পূর্ণ গোপণীয়তা রক্ষা হবে)

১। অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন ----------

২। আপনার বর্তমান বয়স কত বলুন ----- বছর

৩। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন -------

৪। আপনার বর্তমান মাসিক আয় কত-------- টাকা

৫। আপনার পেশা সম্পর্কে বলুন ---------

৬। আপনি কোন ইউনিয়নে/গ্রামে বসবাস করেন?

৭। আপনার ইউনিয়ন পরিষদের নাম কি? -----------

৮। আপনি কত নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়েছেন? --------- ওয়ার্ড।

৯। আপনার সাথে কতজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন? ------- জন।

১০। আপনার সাথে নিকটতম প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান কত ছিল? ------ টি।

১১। আপনি কি এর আগে কখনও সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কত বার? ------- বার।

১২। আপনার ইউনিয়নে কোন মহিলা কি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন? হ্যাঁ / না।

১৩। নির্বাচনের পূর্বে আপনি কি রাজনীতি করতেন? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে সরকারী / বেসরকারী

১৪। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আপনাকে কে বেশী উৎসাহ দিয়েছে? স্বামী / শ্বশুর বাড়ীর লোকজন / আত্মীয়-স্বজন / বন্ধুবান্ধব / অন্যান্য।

১৫। আপনি কি নির্বাচনকালীন সময় কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছেন? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরণের ---------

Dhaka University Institutional Repository

১৬। নির্বাচনে জয়ী হবার কারণ আপনি কি বলে মনে করেন? ---------

১৭। আপনার রাজনীতিতে আসার কারণ কি? --------

১৮। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? ---

১৯ আপনার রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আপনার পরিবার কি আপনাকে সহযোগিতা করে? ----

২০। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসাবে আপনি কি কি দায়িত্ব পালন করছেন?---------

২১। আপনি পরিষদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন কোন সমস্যার মুখোমুখি হন?-------

২২। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে আপনি কি অংশগ্রহণ করতে পারছেন? হ্যাঁ / না।

না হলে কোন ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না? -----------

২৩। আপনি কি কাজ করতে গিয়ে নিরাপত্তার অভাব অনুভব করেন? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরনের? -----------

২৪। ইউনিয়ন পরিষদ মহিলা সদস্য হিসেবে এলাকার মানুষ আপনাকে কিভাবে মূল্যায়ন করছে? -------

২৫। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা কি আপনাকে কাজ করার সুযোগ দেয়? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরণের? ---------

২৬। আপনি কি মনে করেন মহিলা সদস্যদের কাজের পৃথক তালিকা থাকা প্রয়োজন? হ্যাঁ / না।

না হলে কারণ কি? ----------

২৭। নির্বাচনের পূর্বে এলাকাবাসীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরবর্তীতে তা রক্ষা করতে পেরেছিনে কি? হ্যাঁ / না।

না হলে কারণ কি? ---------

২৮। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদে পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের আসন বন্টন কাঠামোটি আপনি কি সমর্থন করেন? হ্যাঁ / না।

না হলে কারণ কি? --------

২৯। আপনি কি মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্যদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা উচিৎ? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কারণ কি? -----------

৩০। পরিষদের সভা মাসে কয়টি হয়? ------ টি।

প্রতিটি সভায় আপনি কি উপস্থিত থাকেন? হ্যাঁ / না।

৩১। পরিষদের বিশেষ কমিটিতে আছেন কি? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কি ধরণের? -----------

Dhaka University Institutional Repository

৩২। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন কি? হ্যাঁ / না।

না হলে কারণ কি? ---------

৩৩। সালিশ বিচারে আপনি যান কি? হ্যাঁ / না।

সালিশ বিচারে আপনি রায় দিতে পারেন কি? হ্যাঁ / না।

না হলে কারণ কি? ---------

৩৪। আপনি নির্বাচনে কত টাকা ব্যয় করেছেন? ----------

৩৫। আপনার টাকার উৎস কি? স্বামী / আত্মীয়-স্বজন / জনগণ।

৩৬। আপনাকে ইউনিয়ন পরিষদ কত সম্মানী দেয়? ------------ টাকা

এ সম্মানীতে আপনি কি সন্তুষ্ট? হ্যাঁ / না।

না হলে আপনার সুপারিশ বলুন ----------

৩৭। ১৯৯৮ সালের পর বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে নারী সদস্যদের ভূমিকাকে স্পষ্ট করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

স্বাক্ষর ঃ

ধন্যবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ ঢাকা জেলার দক্ষিণগাঁও ও নাসিরাবাদ ইউনিয়ন পরিষদের উপর একটি সমীক্ষা।

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পূরণার্থে একটি গবেষণা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা)

সুশীল সমাজ/জনসাধারণের মতামত জরিপের প্রশ্নমালাঃ (সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর সম্পূর্ণ গোপণীয়তা রক্ষা হবে)

১। অনুগ্রহ করে আপনার নাম বলুন ----------

২। আপনার বর্তমান বয়স কত বলুন ----- বছর

৩। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন -------

৪। আপনার বর্তমান মাসিক আয় কত-------- টাকা

৫। আপনার পেশা সম্পর্কে বলুন ---------

৬। আপনি কোন ইউনিয়নে/গ্রামে বসবাস করেন?

৭। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / মেম্বারদের সাথে আপনার কি পরিচয় আছে? হ্যাঁ / না।

৮। আপনি কি মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের উপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা তারা যথাযথ ভাবে পালন করে? হ্যাঁ / না।

৯। সদস্যরা কি কাজের সময় এলকাবাসীর সহযোগীতা পায়?

১০ পরিষদের পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা কি কি কাজের দায়িত্ব পালন করে?

১১। আপনি কি মনে করেন পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে? হ্যাঁ / না। হ্যাঁ হলে কি ধরণের -------

১২। আপনি কি আপনার কোন সমস্যা নিয়ে চেয়ারম্যান/মেম্বারের নিকট উপস্থিত হন? হ্যাঁ / না। আপনার যুক্তি দিন-------

১৩। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান/মেম্বারগণ কি জনগণের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসে? হ্যাঁ / না

১৪। আপনার এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে কি? হয়েছে/হয়নি/কিছু কিছু/বুঝতে পারিনা।

১৫। আপনার এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা এ পর্যন্ত কিকি উন্নয়নমূলক কাজ করেছে?

Dhaka University Institutional Repository

১৬। আপনি কি মনে করেন একজন মহিলা মেম্বারের চেয়ে পুরুষ মেম্বার ভাল কাজ করেন? হ্যাঁ / না।

আপনার যুক্তি দিন -------

১৭। তিনটি ওয়ার্ড হতে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি আপনি কি সমর্থন করেন? হ্যাঁ / না।

না হলে কারণ কি? -------

১৮। আপনার এলাকার নারী প্রতিনিধিরা নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা তারা পরবর্তীতে পালন করেছে কি? হ্যাঁ / না

না হলে কারণ কি? -------

১৯। নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আপনি কি সমর্থন করেন? হ্যাঁ / না

২০। নারীদের রাজনীতিতে কতটুকু অংশগ্রহণ করা উচিৎ? -------

২১। মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বড় বাধা কি কি বলে আপনি মনে করেন?

এই বাধা দূর করার সম্ভাব্য পদ্ধতিগুলো কি কি?

আপনার বক্তব্য দিন --------

২২। নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধির কি নিরাপদে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন? হ্যাঁ / না।

না হলে কারণ কি? -------

২৩। আপনি কি মনে করেন মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা আরও বাড়ান উচিত? হ্যাঁ / না।

২৪। আপনি কি মনে করেন মহিলা প্রতিনিধিদের সহযোগিতা করার জন্য জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন? হ্যাঁ / না।

২৫। আপনি কি মনে করেন যে টাকা ইউনিয়নের উন্নয়নের জন্য সরকার বরাদ্দ দেয় তা ভালভাবে ব্যয় হয়? হ্যাঁ / না।

না হলে কারণ কি? ------

২৬। সরকারের কি আরো বেশী টাকা উন্নয়নের জন্য দেওয়া উচিৎ? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কারণ কি? -----------

না হলে কারণ কি? -----------

২৭। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান / মেম্বারদের সম্মানি কি যথাযথ আছে বলে আপনি মনে করেন? হ্যাঁ / না।

না হলে আপনার সুপারিশ কি? -------

Dhaka University Institutional Repository

২৮। আপনি কি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট দানে অংশগ্রহণ করেছিলেন? হ্যাঁ / না।

নিজেব ইচ্ছা মতো ভোট দিয়েছেন না অপরের ইচ্ছায়?

২৯। আপনার এলাকার মহিলা ভোটাররা কি স্বতঃস্ফুর্তভাবে ভোট কেন্দ্রে আসে? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে কারণ কি? -----------

৩০। আপনার এলাকায় কোন এন.জি.ও কাজ করছে কি? হ্যাঁ / না।

হ্যাঁ হলে গ্রামন্নোয়নে এনজিওগুলো কি ধরণের কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

৩১। এ সব কর্মসূচী গ্রহণের ফলে গ্রামের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে কি? হ্যাঁ / না।

৩২। গ্রাম সরকার গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে কি? হ্যাঁ / না / বুঝতে পারি না।

স্বাক্ষর ঃ

ধন্যবাদ